لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

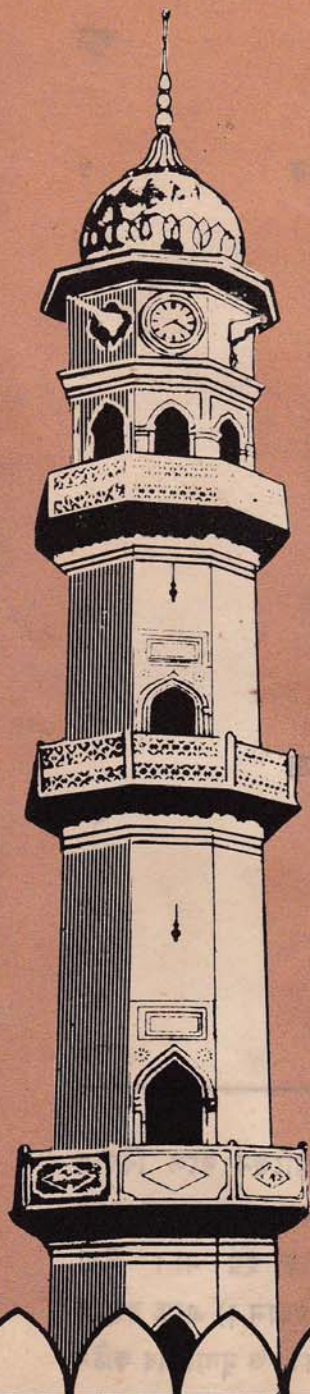

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১৩শ সংখ্যা

২রা শাবান, ১৪১৪ হিঃ ।। ২রা মাঘ ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৩শ সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা মুঃ মাযহারুল হক ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ১০

হুযূরের তাজা ঈমানবর্ধক ভাষণ

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ১৭

পত্র-পত্রিকা থেকে ঃ

ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৯

বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে জামাতের নতুন ষড়যন্ত্র

জনাব শাহরিয়ার কবীর ২০

এটি শুভ লক্ষণ নয়

জনাব হারুনুর রশীদ ২৬

সংবাদ ৩৩

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪০

সম্পাদকীয় ঃ ৪৯

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

সত্ত্বেও মুসলিম উম্মতের অনেক ফের্কাই ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করেন। অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনাতে কবরে সমাহিত আছেন বলে জ্ঞান রাখেন। এক্ষেত্রে ঈসা (আঃ) অনন্তকাল জীবিত থাকলেও শিরক হয় না। ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগেও ছিলেন এবং পরেও আসবেন (এবং থাকবেন ?) এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কোন অমর্যাদা হয় না! এদের হাতে নবুওয়তের তাৎপর্য ও মূল্যবোধ কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছে। এদের কারসাজিতে ঈসা (আঃ) জনমানবহীন আকাশে বাস করেন আর মহানবী (সাঃ) ধরার মাটিতে চির নিদ্রায় থেকে হাশরের দিনের অপেক্ষায় আছেন। মাঝখানে তাঁর উম্মত শিরকের নূতন সংজ্ঞা আবিষ্কার করে চলেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ : ১৫ই সুলাহ্ ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ২রা মাঘ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রভুকে ডাকিয়া (৪০৫) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

৪০। যখন সে মেহ্‌রাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার (৪০৬) সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক বাক্যের সত্যায়ণকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী (৪০৭) হইবে'।

৪১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র (৪০৮) কীরূপে হইবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? তিনি বলিলেন এইরূপেই আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন।'

৪০৫। শিশু বা কিশোরী মরিয়মের এই উত্তর যাকারিয়্যার মনে এমনি গভীর রেখাপাত করিল যে, তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই স্বাভাবিক উদাত্ত বাসনা জাগিয়া উঠিল, তাহারও যদি এমন একটি পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ সন্তান লাভ হইত! তিনি সাথে সাথে প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। এই দোয়া সম্ভবতঃ তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বার বার করিয়াছিলেন, কেননা কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দের বিভিন্নতাসহ এই দোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায় (৩:৩৯, ১৯:৪-৭, ২১:৯০)।

৪০৬। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (যোহন) সেই নবীর নাম যিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর অগ্রদূত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (মালাকি ৩:১ এবং ৪:৫)। এই নামের হিব্রু রূপ হইল 'ইউহান্না' যাহার অর্থ হইল, 'আল্লাহ্ দয়াপরবশ হইয়াছেন' (এনসাই, বৃট)। ইয়াহ্‌ইয়া নামটি আল্লাহ্-প্রদত্ত।

৪০৭। যোহন (ইউহান্না বা ইয়াহ্‌ইয়া) মালাকি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই- 'মনে রাখিও, আমি প্রভুর মহান ও ভীতি-সঙ্কুল দিনে (সময়ে) এলিজা নবীকে পাঠাইব, (মালাকি-৪:৫)।

৪০৮ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য (আদেশপূর্বক) কোন নিদর্শন (৪০৯) দান কর।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন (৪১০) যাবৎ লোকের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না। এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

৪র্থ রুকূ

৪৩। এবং (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্‌তাগণ (৪১১) বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে মনোনীত (৪১২) করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন'।

৪০৮। 'গোলাম' অর্থ যুবক (লেইন)। অতিবৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর পুত্র-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি, যাকারিয়্যাকে বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেল করিয়া তুলিল, তিনি জিজ্ঞাসু মনে স্বভাবিক-সরল বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহাও পার। অভিব্যক্তির মধ্যে আচ্ছন্ন দোয়াও রহিয়াছে যে, তিনি যেন তাঁহার সন্তানকে যুবক অবস্থায় দেখিয়া যাইবার মত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন।

৪০৯। যাকারিয়্যাকে তিনদিন নীরবে নিভৃতে কাটাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল ও তাহা পালনের পর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইল। কিন্তু সুসমাচার পাঠে দেখা যায় ঐশী-বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন না করার কথিত অপরাধে তাঁহাকে তিনদিনের জন্য বাক্‌শক্তিহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (লুক-১:২০-২২)।

৪১০। যাকারিয়্যার প্রতি নীরবতা পালনের নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তিনি ধ্যান-আরাধনা ও প্রার্থনাতে একান্তভাবে দিনগুলি কাটাইতে পারেন এবং আল্লাহ্‌-তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। নীরবতা অবলম্বন দ্বারা হৃত জীবনীশক্তি ও শারীরিক বল পুনরুজ্জীবিত হয় বলিয়াও দেখা গিয়াছে। এই ধারণা ও অভ্যাস মনে হয় তখনকার দিনের ইহুদীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৪১১। 'ফিরিশ্‌তারা' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহারের স্বকীয় তাৎপর্য রহিয়াছে। যদি কেবলমাত্র একটি সংবাদ প্রদানই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে একজন সংবাদ-বাহক ফিরিশ্‌তাই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। কুরআনের বাক্‌ধারা অনুযায়ী ফিরিশ্‌তার বহুবচন তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে বিরাট ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু এই ক্ষেত্রেও মরিয়মের পুত্র দ্বারা পৃথিবীতে মহা পরিবর্তনের ইচ্ছা রহিয়াছে, সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণকে এই সুসংবাদ বহনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দান করলেন, যাহাতে ঈপ্সিত পরিবর্তন সাধনে মরিয়ম ও মরিয়ম-পুত্রকে তাহারা সাহায্য করেন।

৪১২। এই আয়াতে 'নির্বাচিত' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমবার ব্যবহৃত হইয়াছে মরিয়মের স্বকীয় উচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। আর দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার সম-সাময়িক মহিলাগণের তুলনায় তাঁহার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। কুরআনে ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী 'নিসাউল আলামীন' বলিতে এখানে সর্বকালের সকল নারীকে বুঝায় নাই বরং মরিয়মের সম-সাময়িক সকল নারীকে বুঝাইয়াছে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা মু. মাযহারুল হক

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন—

العلماء ورثة الانبياء - ولم يورثوا دينارا ولا درهما - وانما ورثوا العلم - فمن اخذه اخذ بحظ وافر -

অর্থ : "আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ না দীনার আর না দিরহামের উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছেন ; বরং তাহারা শুধু 'ইল্‌ম' (জ্ঞান)-এর উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছেন। যে-ব্যক্তি উহাকে গ্রহণ করে, সে এক বিপুল সম্পদাংশকে গ্রহণ করে।"

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন—

يأتى على الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه - مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى - علماء هم شر من تحت اديم السماء - من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود -

—"লোকদের উপর এইরূপ এক যামানা আপতিত হইবে—যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং কুরআনের লেখা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না (আমল উঠিয়া যাইবে)। তাহাদের মসজিদসমূহ লোকে পরিপূর্ণ, জমকালো ও চাকচিক্যময় হইবে ; কিন্তু, উহারা হেদায়াতশূন্য হইবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম ও বর্বরতম হইবে। তাহারাই হইবে ফেতনা-ফাসাদের উৎস।" (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসদ্বয় বাহ্যতঃ পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও উহারা প্রকৃতপক্ষে পরস্পর-বিরোধী নহে। প্রথমোক্ত হাদীসে আলেমগণ কর্তৃক একটি নে'আমত লাভ করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আলেমগণ নবীগণ হইতে দীনি এলেম লাভ করেন। উহা আল্লাহ্‌তা'লার একটি বড় নে'আমত। উক্ত নে'আমত লাভ করিয়া কেহ তদনুসারে নেক আমল করিয়া এবং অন্যদের নিকট উহার তবলীগ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার নেক বান্দাও হইতে পারে অথবা সে তদনুসারে আমল এবং উহার তবলীগ না করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তোষভাজন এবং মাগ্‌যূবও হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, শুধু আলেম হইলেই আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রিয় হওয়া যায় না ; বরং তাঁহার নিকট প্রিয় হইবার জন্য এলেম,

ঈমান ও আমল এ সকল গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। আবু জাহ্‌ল—যাহার উপাধি ছিল আবুল হিকাম বা জ্ঞান-রাজ্যের পিতা—একজন আলেম ছিল; কিন্তু, সে ঈমান ও আমলের অধিকারী ছিল না। এই কারণেই জ্ঞানীগণ উলামাকে উলামা-ই-সূ (علمائے سوء অসৎ আলেমগণ) এবং উলামা-ই-খায়্‌র (علمائے خیر —সৎ আলেমগণ)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

শেষোক্ত হাদীসে রসূল (সাঃ) যে নিকৃষ্টতম উলামা-এর কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা শুধু এলেমের অধিকারী অতএব উলামা নামধারী হইবে। প্রকৃত ঈমান ও আমলের অধিকারী না হওয়ায় এবং বদ আমলে নিজেদের আত্মাকে জঘন্যরূপ অপবিত্র করায় তাহারা উলামা হইয়াও নিকৃষ্টতম প্রাণী বলিয়া রসূল (সাঃ) কর্তৃক আখ্যায়িত হইয়াছে।

আলেমগণ 'নিকৃষ্টতম প্রাণী' হইয়া গিয়া থাকিলে তাহারা সভা-সমিতিতে লোকদিগকে ডাকিয়া কোনদিন কি এই কথা বলিবে যে,—হে লোক সকল! রসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা 'নিকৃষ্টতম প্রাণী' হইয়া গিয়াছি; অতএব, তোমরা এখন আমাদের অনুসরণ না করিয়া বরং ইমাম মাহদীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও?' বরং আলেমদের আচার-আচরণ ও আখলাক-চরিত্র দেখিয়াই লোকদিগকে উহা বুঝিয়া লইতে হইবে। বর্তমান যুগে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা আলেমগণ কর্তৃক সর্বাধিক বিঘ্নিত ও বিপদাপন্ন দেখা যায়। উহা নিকৃষ্টতম চরিত্রের অন্যতম দিক বটে।

একদিকে আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন মজীদে বলিয়াছেন—انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء "আল্লাহ্‌কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে শুধু আলেমগণই ভয় করে।" অন্যদিকে রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন— علماء ھم شرمن تحت اديم السماء তাহাদের আলেমগণ হইবে আকাশের নীচে বসবাসকারী প্রাণীকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

উক্ত আয়াত ও হাদীসের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ বিরোধ নাই। আয়াতের অর্থ এই নহে যে, কোনও ব্যক্তি আলেম হইলেই সে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করে; বরং আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্-ভীতি শুধু আলেমের মধ্যেই থাকিতে পারে—অন্য কাহারও মধ্যে থাকিতে পারে না।

আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইসলামী পরিভাষায় হক্ ও সত্যের জ্ঞানের নাম হইতেছে এলেম বা ইল্‌ম আর উক্ত জ্ঞানের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান—ব্যক্তি তিনি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদের অধিকারী হউন অথবা না হউন—হইতেছেন আলেম। হযরত বেলাল (রাঃ) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সে দিনও তিনি আলেম ছিলেন। এতদনুসারে প্রত্যেক হক্ ও সত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিই ইসলামী পরিভাষা মতে আলেম।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে 'উলামায়ে' সূ-এর গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা হইতে নাজাত দান করুন। আমীন।।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর
অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূ'ইয়া

(১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

নির্বুদ্ধিতা ও বক্র ধারণার দরুন এই আয়াতের অর্থ করা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সকল লোক নিজেদের 'নফ্সে আম্মারার' (অবাধ্য আত্মার) দাস হইয়া কোরআনের সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করে এবং ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য সন্দেহব্যাঞ্জক আয়াতের আশ্রয় খোঁজে! তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত এই সকল আয়াত তাহাদের কোন কাজে আসিতে পারে না। কেননা আল্লাহ্তা'লার উপর ঈমান আনা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা এই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে যে, কুরআন শরীফ ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, খোদাতা'লা কুরআন শরীফে 'আল্লাহ্' নামের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভূ, অযাচিত দাতা এবং দয়ালু, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে ৬ (ছয়) দিনে বানাইয়াছেন, আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, কেতাবসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সর্বশেষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি খাতামাল আম্বিয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। কুরআন শরীফ অনুযায়ী শেষ দিবসে মৃতরা জীবিত হইয়া উঠিবে এবং একটি দলকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পুরস্কারের স্থান এবং একটি দলকে দোযখে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক শাস্তির স্থান। খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বলেন, এই শেষ দিবসে ঐ সকল লোকেরাই ঈমান আনে যাহারা এই কেতাবে ঈমান আনে।

অতএব যে-স্থলে আল্লাহ্তা'লা নিজেই 'আল্লাহ্' শব্দের ও 'শেষ দিবসের' ব্যাখ্যাসহ অর্থ করিয়া দিয়াছেন, যাহা ইসলামের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে-স্থলে যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য হইবে। এই অর্থের পরিবর্তন ঘটানোর অধিকার কাহারো নাই। নিজের পক্ষ হইতে এইরূপ অর্থ আবিষ্কার করার শক্তি আমার নাই, যাহা কুরআন শরীফের বর্ণিত

অর্থ হইতে ভিন্ন এবং ইহার বিরোধী। আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশের সহিত দেখিয়াছি, বার বার দেখিয়াছি এবং ইহার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি নিশ্চিতরূপে ইহা জানিয়াছি যে, কুরআন শরীফে যে পরিমাণে খোদার গুণাবলী ও কার্যাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে, الحمد لله رب العالمين ٥ الرحمن الرحيم (সূরা আল্-ফাতেহা, আয়াত ২-৩)। (অর্থ:—সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়—অনুবাদক)। অনুরূপভাবে এই ধরনের আরো অনেক আয়াত আছে, যাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তিনি, যিনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব যেহেতু কুরআনী পরিভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দে ইহা অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেহেতু ইহা জরুরী, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিবে, তাহার এই ঈমান কেবল তখনই নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনিবে। খোদাতা'লা এই আয়াতে ইহা বলেন নাই যে,

من امن بالرحمن يامن امن بالرحيم يامن امن بالكريم

(অর্থ:—যে রহমানের উপর ঈমান আনে, বা যে রহীমের উপর ঈমান আনে, বা যে করীমের উপর ঈমান আনে—অনুবাদক)। বরং বলা হইয়াছে যে من امن بالله (অর্থ:—(আল্লাহর উপর ঈমান আনে—অনুবাদক) এবং আল্লাহর অর্থ ঐ সত্তা, যিনি সমষ্টিগত গুণের আকর। তাঁহার একটি অদ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা কেবল এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে পারি যে, সে আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই ঈমান আনে যখন সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরও ঈমান আনে এবং কুরআন শরীফের উপরও ঈমান আনে। যদি কেহ বলে, তাহা হইলে ان الذين امنوا (অর্থ: যাহারা ঈমান আনিয়াছে—অনুবাদক) এর অর্থ কি? স্মরণ রাখিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে, যে সকল লোক কেবল খোদাতা'লার উপর ঈমান আনে তাহাদের ঈমান নির্ভরযোগ্য নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা খোদার রসূলের উপর ঈমান আনে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ঐ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। এই কথা স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফে স্ববিরোধিতা নাই। অতএব শত শত আয়াতে খোদাতা'লা যখন বলেন কেবল তওহীদ যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার নবীর উপর ঈমান আনা নাজাতের জন্য জরুরী (কেবল এই অবস্থা ব্যতীত যে, কেহ এই নবী সম্পর্কে অনবহিত ছিল), তদবস্থায় কোন একটি আয়াতে ইহার বিপরীত এই কথা বলা যে, কেবল তওহীদ দ্বারাই নাজাত পাওয়া যাইতে পারে—ইহা কীরূপে সম্ভব? তাহারা বলে, কুরআন শরীফ

ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই আয়াতে তওহীদের উল্লেখও নাই। যদি তওহীদই লক্ষ্য হইত তবে এইরূপ বলা উচিত ছিল من امن بالتوحيد (অর্থ: যে তওহীদের উপর ঈমান আনে—অনুবাদক)। কিন্তু আয়াতের শব্দগুলি হইল من امن بالله (অর্থ: যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে—অনুবাদক)। অতএব امن بالله কথাটি আমাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, কুরআন শরীফে 'আল্লাহু' শব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার উপর চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। আমাদের সততার এই দাবী হওয়া উচিত যখন আমরা কুরআন শরীফ হইতেই এই কথা জানিয়াছি যে, 'আল্লাহ' শব্দটিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি কুরআন প্রেরণ করিয়াছেন এবং মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আমাদের ঐ অর্থটিই গ্রহণ করা উচিত যাহা কোরআন শরীফ বর্ণনা করিয়াছে। নিজের পক্ষ হইতে কোন অর্থ করা উচিত নহে।

এতদ্ব্যতীত আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, নাজাত লাভের জন্য খোদাতা'লার অস্তিত্বের উপর মানুষের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া জরুরী। কেবল বিশ্বাসই নহে, বরং অনুবর্তিতার জন্যও তাহার বদ্ধপরিকর হইয়া যাওয়া উচিত এবং তাঁহার সন্তুষ্টির পথসমূহ সনাক্ত করা উচিত। যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এই দুইটি বিষয় কেবল খোদা-তা'লার রসূলগণের মাধ্যমেই অর্জিত হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তওহীদে বিশ্বাসী, কিন্তু সে খোদাতা'লার রসূলের উপর ঈমান না আনা সত্ত্বেও নাজাত পাইয়া যাইবে —ইহা নিতান্ত বাজে ধারণা। হে জ্ঞানান্ধ নির্বোধেরা! রসূলের মাধ্যম ছাড়া তওহীদ কবে লাভ করা গিয়াছে? উহার দৃষ্টান্ততো এইরূপই যেমন এক ব্যক্তি দিনের আলোকে ঘৃণা করে এবং উহার নিকট হইতে পালাইয়া বেড়ায়, তারপর বলে, আমার জন্য সূর্যই যথেষ্ট, দিনের কি প্রয়োজন? ঐ নির্বোধ জানে না যে, সূর্য কি কখনো দিন হইতে পৃথক হইতে পারে? আফসোস, এই সকল নির্বোধ বুঝে না যে, খোদাতা'লার সত্তা গোপন হইতে গোপনতর, অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর এবং পর্দার অন্তরাল হইতে অন্তরালতর। কোন জ্ঞান তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না, যেমন তিনি নিজেই বলেন,

لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار (সূরা আল্-আনআম: আয়াত ১০৪)। অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টি তাঁহাকে পাইতে পারে না। আল্লাহ্ তাহাদের শেষ সীমা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। অতএব তাঁহার তওহীদ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। কেননা তওহীদের তাৎপর্য এইরূপ যেরূপে আকাশের মানুষ মিথ্যা উপাস্য হইতে হাত গুটাইয়া নেয়, অর্থাৎ প্রতিমা বা মানুষ বা সূর্য-চন্দ্র, প্রভৃতির পূজা হইতে পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপেই প্রবৃত্তির মিথ্যা

উপাস্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ সে নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিসমূহের উপর ভরসা করা হইতে এবং উহাদের মাধ্যমে অহংকারের বিপদে পতিত হওয়া হইতে নিজেকে রক্ষা করে। অতএব এমতাবস্থায় ইহাই সুস্পষ্ট যে, আমিত্ব পরিহার এবং রসূলের আঁচল ধরা ছাড়া পরিপূর্ণ তওহীদ লাভ করা সম্ভব নহে।

যে-ব্যক্তি নিজের কোন শক্তিকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করে তাহাকে কীভাবে একেশ্বরবাদী (এক খোদায় বিশ্বাসী) বলা যাইতে পারে। এই কারণেই কুরআন শরীফ বহু স্থানে পরিপূর্ণ তওহীদকে রসূলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। কেননা পরিপূর্ণ তওহীদ এক নূতন জীবন এবং ইহা ছাড়া নাজাত লাভ করা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার রসূলের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া স্বীয় পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আনয়ন করা হবে। ইহা ব্যতীত এই সকল নির্বোধের কথা অনুযায়ী কুরআন শরীফ নিশ্চিতভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবে। কেননা একদিকে তাহারা বারবার বলিতেছে যে, রসূলের মাধ্যম ছাড়া না তওহীদ লাভ করা সম্ভব আর না নাজাত লাভ করা সম্ভব, অন্যদিকে তাহারা যেন ইহা বলিতেছে যে, লাভ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে তওহীদ ও নাজাতের সূর্য এবং ইহার প্রকাশকারী কেবল রসূলই হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতিতেই তওহীদ প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি খোদার কালামের (কথার) প্রতি আরোপিত হইতে পারে না।

এই সকল নির্বোধের বড় ভ্রান্তি এই যে, তাহারা তওহীদের তাৎপর্য একেবারেই বুঝে নাই। তওহীদ একটি জ্যোতিঃ, যাহা জাগতিক উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করার পর হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহা খোদা ও রসূলের মাধ্যম ছাড়া নিজ শক্তিতে কীভাবে লাভ করা যাইতে পারে? মানুষের কাজ কেবল এই যে, সে নিজ আমিত্বের উপর মৃত্যু আনয়ন করিবে। এই শয়তানী অহংকার পরিত্যাগ করিবে যে, আমি একজন জ্ঞানী-গুণী বরং নিজেকে এক অজ্ঞের ন্যায় মনে করিবে এবং দোয়ায় নিয়োজিত থাকিবে। তাহলে তওহীদের জ্যোতিঃ খোদার তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাকে এক নূতন জীবন দান করা হইবে।

অবশেষে আমি ইহা বর্ণনা করাও জরুরী মনে করি যে, যদি আমরা আপাততঃ ধরিয়া লই যে, 'আল্লাহ্' শব্দটি একটি সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য, যাহার অনুবাদ 'খোদা', এবং ঐ সকল বিষয় উপেক্ষা করি যাহা কুরআন শরীফ পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, অর্থাৎ আল্লাহ্ শব্দটিতে ইহা অন্তর্ভুক্ত আছে যে, তিনি ঐ সত্তা যিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, তবুও এই আয়াত বিরুদ্ধবাদীদের কোন উপকারে আসিতে পারে না। কেননা ইহার অর্থ এই নহে যে, কেবল আল্লাহ্তা'লাকে মানা নাজাতের জন্য যথেষ্ট। বরং ইহার অর্থ এই যে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে, যাহা খোদাতা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম এবং যাহা তাঁহার সর্বগুণের সমষ্টিগত আকর, তিনি তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং ক্রমান্বয়ে তাহাকে ইসলামের

দিকে লইয়া আসিবেন। কেননা একটি সত্যতা অন্য একটি সত্যতায় প্রবেশ করার জন্য সাহায্য করে। আল্লাহ্‌তা'লার উপর খাঁটি ঈমান আনয়নকারীরা অবশেষে সত্য পাইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, والذين جٰهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (সূরা আল-আনকবূত—আয়াত ৭০)। (অর্থ ঃ—এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব—অনুবাদক)!

অতএব এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনয়নকারীকে বিনষ্ট করা হয় না। অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে পরিপূর্ণ হেদায়াত দান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সুফীগণ ইহার শত শত দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কোন কোন ভিন্ন ধর্মের লোক যখন পরিপূর্ণ নিষ্ঠাসহ খোদাতা'লার উপর ঈমান আনিল এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হইল তখন খোদাতা'লা তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠার এই প্রতিদান দিলেন যে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং বিশেষ ফযল দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই আয়াতের শেষ অংশে فلهم اجرهم عند ربهم (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত ২৭৫) এর অর্থ ইহাই। খোদাতা'লার পুরস্কার যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশিত না হয় পরকালেও প্রকাশিত হয় না। অতএব পৃথিবীতে খোদাতা'লার উপর ঈমান আনার এই পুরস্কার পাওয়া যায় যে, এইরূপ ব্যক্তিকে খোদাতা'লা পূর্ণ হেদায়াত দান করেন এবং বিনষ্ট করেন না। ইহার প্রতিই এই আয়াতও و ان من اهل الكتٰب الا ليؤمنن به قبل موته (সূরা আল্ নেসা ঃ আয়াত ১৬০) ইংগিত করিতেছে। অর্থাৎ যে সকল লোক প্রকৃতপক্ষে আহ্‌লে-কেতাব এবং খাঁটি অন্তঃকরণে খোদার উপর ও তাঁহার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনে ও আমল করে তাহারা অবশেষে এই নবীর উপর ঈমান আনিয়া ফেলিবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছে। হাঁ, দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাহাদিগকে আহ্‌লে কেতাব বলা উচিত নহে, তাহারা ঈমান আনে না। এইরূপেই ইসলামের ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায়, খোদাতা'লা এতই দয়ালু ও দাতা যে, যদি কেহ এক বিন্দু পরিমাণও পুণ্য কাজ করে তবুও উহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। যেমন এক হাদীসেও আছে যে, কোন এক সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিবেদন করিল যে, আমি কুফরীর অবস্থায় কেবলমাত্র খোদাতা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক ধন-সম্পদ মিসকীনদিগকে দিয়াছিলাম, ইহার প্রতিদানও কি আমি লাভ করিব? তখন তিনি বলেন, ঐ দান-খয়রাতই তোমাকে ইসলামের দিকে টানিয়া আনিয়াছে। অতএব এইভাবেই যদি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীলোক খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় জানে এবং তাঁহাকে ভালবাসে তবে খোদাতা'লা فلهم اجرهم عند ربهم (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ২৭৫) আয়াত অনুযায়ী অবশেষে তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। ইহাই বাবা নানকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বড়ই নিষ্ঠার সহিত মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করিয়া তওহীদ গ্রহণ করেন এবং খোদাতা'লার সহিত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন ঐ খোদা, যিনি উপরোক্ত আয়াতে বলেন فلهم اجرهم عند ربهم তিনি তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং স্বীয় ইলহাম দ্বারা তাহাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন। তখন তিনি মুসলমান হইয়া যান এবং হজ্জ করেন। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৫-২-৯৩ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খোদাতা'লার অনুগ্রহে আহমদী জামাত বসনিয়ার মুহাজেরগণের সাথে অসাধারণ ভালবাসার ব্যবহার করছে।

সময় বলে দেবে যে, আমরাই মুসলিম উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী।

ভবিষ্যত বিপদাবলী থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই পথ যে, মুসলমানগণ যেন শীঘ্র ধৈর্যের আশ্রয়ে অবস্থান নেয়।

মুসলিম উম্মাহকে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দরদভরা পরামর্শ অন্য কেউ দিতে পারে না।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত তারা যেন সত্যতা ও ধৈর্যের প্রতি ফিরে আসে। দুনিয়াতে ধৈর্যের ন্যায় আর কোন শক্তি নেই।

(১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ঃ

পরাশক্তিগুলোর এদের প্রেসিডেন্ট ও সরকারের বড় বড় কর্মকর্তাগণ অথবা রাজনীতি-বিদগণ নিজেরা অস্থিরতার মধ্যে রয়েছেন আর এ অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। যেমন বর্তমানকালে ইউরোপের যে অবস্থা বিরাজমান যদি আপনি গভীর দৃষ্টিতে ইউরোপের রাজনীতির পর্যালোচনা করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেকটি সরকার আগের চেয়ে অধিক অস্থিরতার শিকার হচ্ছে। এবং আমেরিকারও এহেন অবস্থা। একটি অস্থিরতা কমে তো অপর আর একটি অস্থিরতা চলে আসে। তারা একদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন নির্যাতন চালালে এক্ষেত্রে যেদিক থেকে দৃষ্টি সরানো হয় সেদিকে পুনরায় অশান্তি বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। আর যদি একবার উত্তপ্ত হওয়া শুরু করে তাহলে এসময়ে সারা দুনিয়ায় অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। না কোন পরাশক্তি আরামে ধৈর্যের সাথে বসে থাকে, না কোন ক্ষুদ্র শক্তি ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের ধৈর্যের সাথে কাজ করা দরকার এবং যেহেতু মুসলমানদেরকে এ যুগে বিশেষভাবে নির্যাতিত হওয়ার কথা এজন্যে তাদেরকে বিশেষভাবে ধৈর্য অবলম্বন করার জন্যে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। অতএব মুসলিম

জাতির সম্মুখে মুক্তির দু'টি পথই মাত্র রয়েছে। সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর বর্তমান সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এত মিথ্যের প্রাদুর্ভাব যে, যেভাবে পচা মাংসে কেবল হাড়গোরগুলোই দেখা যায়। এভাবে বহুল পরিমাণে মিথ্যে বলা হয় এমন সমাজে মিথ্যেবাদীরা গিজ গিজ করেছে। অনেক অনভিপ্রেত দৃশ্যাবলী দেখা যায় আর ছোট বড় অধিকাংশ মিথ্যেবাদী হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদগণ বিশেষভাবে মিথ্যেবাদী। সরকার থেকে বাইরে থাকলে রাজনীতিবিদগণ মিথ্যাকে ঘৃণা করেন, মিথ্যাকে পদতলে পিষে ফেলার দাবী করেন। কিন্তু ঐ রাজনীতিবিদগণই যখন সরকার গঠন করেন তখন মিথ্যে তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। আমি কোন একটি দেশের কথা বলছি না। ইহা একটি সাধারণ অবস্থা যা সমগ্র জগতে দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম দেশগুলো এথেকে ব্যতিক্রম নয়। অতএব মুসলমানদের জন্যে বিশেষ উপদেশ এই যে, তোমরা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হও। সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করো নচেৎ তোমরাও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মত ক্ষতিকর সময়ের শিকার হয়ে যাবে। পুনরায় (কুরআন মজীদ) বলেছে—ধৈর্যের সাথে কাজ করো। এ নির্যাতনের সময়ে প্রকৃতপক্ষে ধৈর্য ব্যতিরেকে আর কোন পন্থা নেই। যদি মুসলমানগণ ধৈর্যের দ্বারা কাজ নেয় তাহলে তাদের নিজেদের অবস্থার হিসাব নেবার এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচার অধিক সময় মিলবে। যখন ধৈর্যের তাগিদপূর্ণ উপদেশ প্রদান করা হয় তখন লোকেরা মনে করে যে, আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে আর নির্যাতনকারীদের পক্ষে বলা হচ্ছে। কিন্তু খোদার উপদেশ হলো ধৈর্য ধারণের। তাই যদি আমি ধৈর্য ধারণের উপদেশ না দিই তাহলে মিথ্যে বলব। যদি অস্থিরতার ও অসহনশীলতার প্রতিক্রিয়া দেখানোর তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিই ইহা মিথ্যে বলা হবে। আসল ঘটনা এই যে, বর্তমান পর্যায়ে মুসলমানদের সবচে' বেশী ধৈর্য অবলম্বনের তাগিদপূর্ণ উপদেশ দানের প্রয়োজন। আর ধৈর্যের ফলে অনেক বড় নির্যাতন যা তাদের সম্মুখে তাদের চলার পথে অপেক্ষা করছে। ঐ রাস্তার ওপরে অনেক শত্রুই ওঁৎ পেতে বসে আছে। ঐ রাস্তার ওপরেই রয়েছে, যে রাস্তায় আজ আমরা চলেছি আর অনেক আক্রমণ হচ্ছে, অনেক আক্রমণ হয়ে গেছে আর অনেক আক্রমণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ওগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার ইহাই পথ যে, আমরা বর্তমানকালে অনতিবিলম্বে ধৈর্যের আশ্রয়ে এসে যাই। আমার মনে আছে, কিছু দিন পূর্বে যুগশ্লাভিয়াস্থ আলবেনীয়ার অধিবাসীদের কতিপয় নেতৃবৃন্দ আমার সাথে পরামর্শের জন্যে এসেছিলেন। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন ক্রোশিয়ার দিক থেকে প্রথম প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হচ্ছিল আর ঐ জাতি যাদের মধ্যে আলবেনীয়ার মুসলমানগণও ছিল,বসনিয়ার মুসলমানগণও ছিল, তাদের মধ্যে এ ধারণাসমূহ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করছিল যে, আমরাও বিদ্রোহ করে, আমরাও খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ করে নিজেদের ওপরে কৃত পূর্ববর্তী নির্যাতনের প্রতি-শোধ নিয়ে নিই আর আমাদের স্বাধীন সরকার গঠন করি। তখন ইউরোপ থেকে আগত

একটি দল যা বিভিন্ন আলবেনীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ছিল ও পরামর্শের জন্যে আমার নিকট আসল। আমি তাদেরকে বললাম যে, দেখ! তোমাদের এখন তলোয়ারের দ্বারা যুগশ্লাভ সরকারের শাসন ক্ষমতাকে উলটিয়ে ফেলার জন্যে চিন্তা-ভাবনাও করা উচিত নয়। আমি বললাম, ক্রোশিয়াতে যা কিছু হচ্ছে তা কিছুই নয়। এর তুলনায় তোমাদের সাথে যা হবে (তা অনেক মারাত্মক হবে)। ক্রোশিয়ার সাথে যদিও ধর্মীয় বিভেদ ছিল না তবুও তাদের ওপর অনেক নির্যাতন চালানো হয়েছে। আর পাশ্চাত্যে বসবাসকারীরাও বড়ই বিবেচনার সাথে ক্রোশিয়াকে সাহায্যও করেছিল। আমি বললাম, তোমাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। যে মুসলমানগণ তোমাদেরকে অস্ত্র দেবে (যদি কেউ দেয়ও) তাহলে তারা অস্ত্র ফিরিয়ে নেবে এবং যখন পাশ্চাত্য অস্ত্র-সস্ত্র প্রবেশের পথে বিধি-নিষেধ আরোপ করবে তখন কারও সাহসই হবে না যে, তোমাদেরকে অস্ত্র পৌঁছে দিতে পারে। ফলতঃ তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিনাশ করে দেয়া হবে। যে অবস্থা হয়েছে এর চেয়ে হাজার গুণ খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে। এজন্যে যদি বিবেচনার সাথে নিজেদের মঙ্গলের কথা জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি উহা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই। যেমন, আমি তাদেরকে কয়েকটি কথা বুঝিয়েছি যে, এপন্থায় প্রথমে নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল করো। নিজেদের হাতকে শক্তিশালী করো। নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করো। নিজেদের শিক্ষার মানকে উন্নীত করো এবং আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে স্বাধীনতা নিয়ে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করো। মোটকথা এই যে, আরও বহু কথা-বার্তা হয়েছিল যার বিস্তারিত বিবরণ দান এখানে সমীচীন নয়। তাদের মধ্যে কতক লোক এরূপ ছিল যে, তারা অনেক সান্ত্বনা পেয়ে গেছে এবং কতক এরূপ ছিল যারা তাদের অস্থিরতাকে এই বলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে যে, দেখলে তো! তোমাদের সম্বন্ধে যেভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তোমরা পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ সেভাবেই পরামর্শ দিয়ে দিলে। আমি তাদেরকে বললাম যে, সময় আসবে যখন আপনাদেরকে বলে দেবে যে, আমি খোদা কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ, পাশ্চাত্য কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ নই ; কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদা কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ। তিনি যখন আপনাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির পরামর্শ দেন তখন আপনারা বলে দেন যে, এ তো শত্রুর পক্ষে কথা বলা হচ্ছে। আর যারা বাহ্যতঃ আপনাদেরকে ন্যায়-সঙ্গত পরামর্শ দিচ্ছেন তারা প্রকৃতপক্ষে আপনাদেরকে শত্রুর কবলে নিপতিত করছেন। তারা এমন বিপদে ফেলে দিচ্ছেন যাথেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আপনারা দেখবেন, সময় বলে দেবে যে, আমরাই মুসলিম উম্মাহ্র প্রকৃত কল্যাণকামী আর আমাদের চেয়ে অধিকতর দরদভরা পরামর্শ মুসলিম উম্মাহ্কে কেউ দিতে পারে না। এর পরে আমার সাথে কয়েকজন যুগশ্লাভীয় সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের উপরোক্ত বিষয়টি জানা ছিল আর কয়েকজনের জানা ছিল না। যখন তাদের সাথে কথা বলা হলো

তারা বললেন, আপনি আমাদের ওপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। ঐ দিনগুলোতে ভাবাবেগের আগুন প্রকৃতই দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং বড়ই ষড়যন্ত্র তৈরী হচ্ছিল। যদি আমরা এরূপ কোন ভুল করে বসতাম তাহলে আজ আমরা বসনিয়ার মুসলমানদের যে-অবস্থা দেখছি এ অবস্থাই আমাদের হতো বরং তার চেয়েও অধিক খারাপ হতো। সুতরাং বর্তমান সময়ে ধৈর্যের প্রয়োজন আর এ উভয় গুণ মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে আগে ভাগে নিজেদের মধ্যে বিকশিত করা দরকার।

ধৈর্যধারণকারীগণের অসাধারণ পার্থিব শক্তি ঃ

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলো সত্যতা ও ধৈর্যের দিকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে কোন শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। ধৈর্যের চেয়ে বড় কোন শক্তি দুনিয়াতে নেই। ধৈর্যশীলের যে-শক্তি আছে উহা পার্থিব দিক থেকেও অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করার একটি ফরমূলা। যেমন বাঁধ, যেখানে নদীর পানিকে আটকিয়ে বড় বড় হাওড় ও দীঘি বানানো হয়। উহা আসলে ধৈর্যেরই একটি নমুনা। পানি প্রবাহিত হয়। যদি নদী প্রবাহকে এই বলে থামিয়ে দেয়া যায় যে, এভাবে স্বীয় শক্তিকে নষ্ট কোর না, থেমে যাও, তাহলে শক্তি নষ্ট হয়ে যায় না। উহা জমা হতে থাকে। উহা উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে, ওপরে উঠতে থাকে। উহার উপরিভাগ উন্নীত হতে থাকে। উহার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, পরে তা এক বিরাট শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। যদি ঐ সময়ে উহা ভেঙ্গে যায় তাহলে বিরাট বিরাট এলাকাসমূহকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়। বরং ঐ নদী, যাকে আটকানো হয়েছিলো, কোটি কোটি বছর ধরে প্রবাহিত হলেও ঐ রকম ধ্বংস সাধন করতে পারত না। এথেকে তো আমাদের বাক্‌ধারায় বলা হয় যে, তোমার ওপরে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ধৈর্য প্রথমে জমা হবে তবেই তো বাঁধ ভাঙ্গবে। যদি ধৈর্য জমা না হয়, বরং গালি দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলে অন্তরের ঝাল মিটিয়ে নেয়া হয় এবং কথায় কথায় ঝটপট করে কোন নির্যাতিত ব্যক্তির ওপরে অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালিয়ে বাহ্যতঃ নির্যাতনকারীর ওপরে প্রতিশোধ নেয়া হয়, যেভাবে পাকিস্তানে দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়েছিল যে, ভারতে যে নির্যাতন হয়েছিল এর ফলে কোয়েটা এবং বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু শিশুদেরকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কোন মুসলমানের হৃদয় ইহা সহ্য করতে পারে না আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ইহাই প্রতিক্রিয়া হবে; কেননা মুসলমান নিজেদের নির্যাতনেও এক সীমা অবলম্বন করে এর চেয়ে আগে বাড়তে পারে না। পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তরবীয়ত ও মূর্তিদের তরবীয়তে, এক-অদ্বিতীয় খোদার তরবীয়ত ও মূর্তিদের তরবীয়তের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। সেভাবে মুসলমানগণ তাদের নির্যাতনেও এক সীমা পরিত্যাগ করে সম্মুখে অগ্রসর হয় না। অতএব তাদের প্রতিক্রিয়া ইহাই হবে। কিন্তু আফসোস ইহাই যে, কয়েকজনের ধৈর্যহীনতার ফলে এখন মুসলমানগণ হিন্দুদেরকে ইহা বলতে পারে না যে, তোমরা নির্যাতনকারী।

তোমরা এত পশুতুল্য নির্যাতনের সামর্থ্য রাখ। তারা বলে, তোমরা কি কোন অংশে কম করেছ ? পরিশেষে তোমরাও তো ঐ একই রকম। সুতরাং প্রয়োজন এই যে, মুসলমান দেশগুলো সত্যের প্রতি ফিরে আসুক আর নিজের প্রত্যেক ব্যাপারে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করুক।

সত্যতার বিষয় বস্তু বড়ই ব্যাপক। যখন কুরআন করীম বলে, সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, তখন সত্যের সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে। ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করাও সত্যতার অন্তর্ভুক্ত। আর নির্যাতিত হয়েও পুনঃ সত্যতার কথা উন্নত শিরে বলে বেড়ানো যেন নির্যাতনকারীকে কর্ম দ্বারা নির্যাতনের দিকে আহ্বান করার শামেল আর ইহাও সত্যের উন্নত পর্যায়ের পরিচয়। যেমন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) জেহাদ ও সত্যকে একত্রে মিলিয়ে একই বিষয়রূপে উপস্থাপন করেছেন। যেন একই বস্তুর দু'টি নাম। তিনি বলেছেন: আফযালুল জেহাদে কালিমাতু হাক্কেন এনদা সুলতানেন জায়ের—অর্থাৎ সবচে' উচ্চ ও সবচে' মহান জেহাদ হ'ল কোন অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে কোন ব্যক্তির দণ্ডায়মান হয়ে সত্য কথা বলে দেয়া। অতএব অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলার বিষয়বস্তু আজ ইসলামী সরকারসমূহের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সত্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। যেসব পরাশক্তিকে তারা নিজেদের কর্তা বানিয়ে রেখেছে, যাদেরকে তারা খোদার মত বাহ্যিকভাবে তো পূজা করে না অন্তরে পূজা করে থাকে, তাদের সম্মুখে সত্য কথা কেন বলছে না। নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে তাদের ধ্বনি কেন উচ্চ করছে না, কেন বলছে না যে, তোমরা অন্যায় করছো। সাহস ও শক্তির সাথে কেন একথা তারা বলছে না। যদি তারা এরূপ করে তাহলে জেহাদকারীগণকে আল্লাহ্-তা'লার তরফ থেকে অবশ্যই সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপদেশের ওপরে আমল করে তো দেখুন। কুরআন করীম বলে, সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলে তোমাদের চিকিৎসা হবে। অতএব সরকারের অবশ্য কর্তব্য এই যে, সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হও আর সমগ্র মুসলিম জনগণেরও ঐ একই কর্তব্য যে, তারা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক রাখুক না কেন, তারা যেন আজই সত্যের দিকে ফিরে আসে। সত্যবাদী হওয়ার ফলে এরূপ মহান শক্তির সৌভাগ্য লাভ হবে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি এ সত্যতার শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে পারবে না। পুনরায় ধৈর্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। ধৈর্যের ফলেও যেভাবে আমি এখনই বলেছি যে, বাঁধ (Dam) তৈরী করা বড় বড় অসাধারণ শক্তিগুলোকে একত্রিত করার দ্বিতীয় নাম আর ইহা ধৈর্যের দ্বারা লাভ হয়।

ধৈর্যের ফলে শক্তি ও দোয়ার কবুলিয়ৎ লাভ হয়ে থাকে:

কিন্তু মানবীয় ধৈর্য দু'ভাবে ফল নিয়ে আসে। প্রথমতঃ ধৈর্যের নিজের মধ্যে ঐশী নিয়মানুযায়ী একটি শক্তি আছে আর ঐ শক্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং মুমিনের ধৈর্যের সাথে দোয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। মোমেন

ধৈর্যধারণ করে ফলে তার দোয়াসমূহের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি হতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি খোদার নামে ধৈর্যধারণ করে অথচ তার অন্তরের পূর্ণ চাহিদা এই হয় যে, এখন ভেঙ্গে পড়ো। এখন প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা কোর না। নিজের অন্তরের জ্বলন্ত আগুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করো। এ সময়ে যদি কেউ খোদার খাতিরে ও খোদার নামে ধৈর্য ধারণ করে তখন না কেবল তার ধৈর্যের অসাধারণ শক্তি লাভ হয় বরং ঐ সময়ের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়।

ইহা ঐরূপ দৃষ্টান্ত যেভাবে মা বাচ্চার বাড়া বাড়ির ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে থাকে। মুসলমান মানবমণ্ডলীর সাথে সত্যিকারের সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু মানব-মণ্ডলী মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। আর এরা ধৈর্যের পর ধৈর্য অবলম্বন করতে থাকে এতটুকু পর্যন্ত যে, পরিশেষে ধৈর্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়। এ সময়ের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) এ বিষয়টিকে মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যেমন বলেছেন—সাবধান! ঐসব দোয়া যা অগ্রাহ্য হয় না তাহলো মায়ের নিজ সন্তানের জন্য বদদোয়া। বড়ই হতভাগ্য সন্তান সে, যার জন্যে তার মা বদদোয়া করে; কেননা মায়ের প্রকৃতির মধ্যে ধৈর্যগুণ রয়েছে। ঐ নির্যাতন কোন বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে পরিশেষে মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। আর ঐ অর্থে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে—দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও আর ঐশী দৃষ্টিকোণ থেকেও। সুতরাং মুসলমানদের জন্যে মুক্তির ইহাই সঠিক দু'টি রাস্তা যা সূরা আসর তাদের জন্যে উন্মুক্ত করেছে। আর আমি আশা রাখি যে, মুসলিম দেশসমূহে এ উপলব্ধি জাগ্রত হচ্ছে।

দোয়া করুন যেন সারা দুনিয়ায় আলোর শিখা ছড়িয়ে পড়ে ঃ

সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতের কথাই ধরুন। জামা'তের তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মোকদ্দমা যা কয়েকবছর পূর্বে দায়েরকৃত বা বিচারাধীন ছিল। ইতোপূর্বে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত নিজেই উত্তম অবগত আছেন যে, কোন সরকারের অঙ্গুলী হেলনে কেসের শুনানী গ্রহণ করার পর্যন্ত তাদের শক্তি ছিল না। এখন ক্ষেত্র পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয়, কেননা সর্বোচ্চ আদালত না কেবল ঐসব মোকদ্দমার শুনানীই গ্রহণ করেন বরং যে-ধরণের মন্তব্য হয়েছে তাতে ধারণা করা যায় যে, তাঁরা ইহা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন যে, আমরা ন্যায়-বিচারের আঁচল হাত থেকে ছাড়ব না। যদি এ সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে তাহলে আমি পাকিস্তানকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো হয়েছে। যদি সর্বোচ্চ আদালত থেকে ন্যায়-বিচারের নিশ্চয়তা জারী করে দেয়া হয় আর সরকার এ ন্যায়-বিচারকে গ্রহণ করে। তাহলে অবশ্যই ঐ দেশের ভাগ্য ফিরে যাবে এবং অবশ্যই এ দেশ সত্যের প্রতি না প্রত্যাবর্তন করলেও ইহাকে

প্রত্যাবর্তন করানো হবে। ইহা খোদার নিয়তির নিকট থেকে অতীব প্রিয় ইঙ্গিত বলে আমি দেখতে পাচ্ছি; যেভাবে দীর্ঘ অন্ধকার রজনীর পরে কোন আলোর ঝলক পরিদৃষ্ট হয়। সর্বোচ্চ আদলতের সবচে' সিনিয়ার বিচারকগণের মন্তব্য শুনে কখনও কখনও বিষন্নচিত্ত ব্যক্তিগণের শরীর শিউরে ওঠবে আর আনন্দিত হয়ে যাবে যে, আলহামদুলিল্লাহ্, পাকিস্তানের আদালতসমূহে ন্যায়-বিচারের প্রিয় ফুল ফুটেছে! কোন এক স্থানে যখন পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেল এ প্রশ্ন উঠালেন যে, আপনারা মৌলিক অধিকারের কথা বলেছেন, চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলেছেন, পাকিস্তানের সংবিধানের ঐ ধারার প্রতি কি আপনাদের দৃষ্টি নেই, যার মধ্যে ইহা বলা হয়েছে যে, ইসলামের Glory (গৌরব) অর্থাৎ মাহাত্ম্য ও মর্যাদার খাতিরে যদি কারও বাক্ স্বাধীনতা আইন করে খর্ব করা হয় তাহলে ইহা সিদ্ধ। যখন ইসলামের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও Glory (গৌরব)-এর নামে আমরা দাবী করছি—তখন আদালত কি সুন্দর জবাবই না দিয়েছেন! আদালত বলেছেন—বড়ই সুন্দর কথা! বড়ই আকর্ষণীয়! কিন্তু আমাকে বলুন তো—ইসলামের Glory (গৌরব) কিসের মধ্যে নিহিত আছে। সংখ্যালঘিষ্ঠকে তাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা/অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে আছে অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠকে বাক্ স্বাধীনতাসহ সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দানের মধ্যে? কেমন আকর্ষণীয় জবাব। খোদা করুন এ প্রবণতা যেন জীবিত থাকে এবং আরও বেশী শক্তিশালী হতে থাকে। খোদা করুন এ চক্রান্তের লালন যেন না হয় যা লালন পালনের চেষ্টা অবশ্যই করা হবে। হিংসার দুনিয়ায় এরূপ হিংসা মাথা চাড়া না দিতে পারে যা এক নিষ্পাপ ব্যক্তির জীবনকে ভস্মীভূত করে দেয়। সুতরাং হিংসুকের হিংসার ক্ষতি থেকে সাহায্য চাও যখনই সে হিংসা করে। খোদাই অবগত আছেন যে, কীভাবে করে এবং কখন করে আর কোথায় করে। তাঁর আশ্রয়ের ছায়ায় এস। অতএব আমি সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে উপদেশ দিচ্ছি যে, ঐ দু'টো কথার ওপরে আমল করো। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে এ যুগকে পরিবর্তন করে দেবেন। যদি এত বড় দীর্ঘ রাতের পরে পাকিস্তানেও একটি আলোর শিখা প্রস্ফুটিত হয় তাহলে কেন সমগ্র দুনিয়ার জন্যে দোয়া করবেন না যে, সমগ্র দুনিয়ায়ও আলো অর্থাৎ খোদার ন্যায়-বিচারের জ্যোতিচ্ছটা প্রস্ফুটিত হোক। আরও বহু এরূপ কথা আজ বলার ছিল কিন্তু সময় যেহেতু হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ্ আগামী খুতবাতে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। খুতবার জন্যে অপেক্ষা করাও বড়ই ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ধৈর্যের জন্যে তাগিদ এসেছে তাই আমি এ তাগিদের সাথেই খুতবা শেষ করছি।

(১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাসের 'মাসিক আখবারে আহমদীয়া' পত্রিকার সৌজন্যে)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

- যে কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করবে সে আকাশে সম্মান লাভ করবে।
- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যাকে পরিহার না করে, সে সুরভিত হতে পারে না।

বাংলাদেশের জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের উদ্দেশ্যে

হুযূরের তাজা ঈমানবর্ধক ভাষণ

(১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত)

জুমুয়ার খোৎবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে নিম্নরূপ বাণী প্রদান করেন ঃ

"মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা ১৭ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর তালীম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত করছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকাই শুধু নয় বরং সমস্ত মজলিস আমেলা, বাংলাদেশ মা-শা'ল্লাহ খুবই চৌকষ ও তৎপর, খুবই সাহসী ও ত্যাগ স্বীকারকারী মজলিস বটে, বিগত বেশ কিছু দিন থেকেই খবর আসছে যে, পাকিস্তানে অকৃতকার্য হয়ে এবং নির্বাচনগুলিতে লাঞ্ছনাজনক মার খেয়ে উলামা এখন বাংলাদেশ অভিমুখি হয়েছেন। তারা সেখানে ঐরূপেই ফেৎনা-ফাসাদ, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়াতে চান যেরূপ পাকিস্তানে করে ছিলেন—সে একই রকম দাবী, হট্টগোল আর সে একই ষড়যন্ত্রের জাল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জামা'তের পক্ষ থেকে বার বার দোয়ার আবেদন আসতে থাকে। আল্লাহ্‌র ফযলে তারা অত্যন্ত সাহসী, অকুতোভয় দৃঢ়চিত্তে মোকাবেলা করে যাচ্ছে। সরকারকে তারা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছে যে, ঐ রকমেই দুষ্কৃতি যদি আপনারা এখানেও করেন যেরূপ পাকিস্তানে করানো হয়েছিল তাহলে আমরা সবাই নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনারা এমনটি মনে করবেন না যে, আমরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়ার দরূন আপনাদেরকে ভয় পেয়ে যাব। কিন্তু এরপর বাংলাদেশ থেকে চিরতরে শান্তি ও সোয়াস্তিও তিরোহিত হয়ে যাবে। এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে পাকিস্তান যে দুরবস্থায় এসে পৌঁছেছে আর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাংলাদেশ তার চেয়েও নিকৃষ্টতর অবস্থায় উপনীত হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেখানে জাতি বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুরবস্থা সেখানে। মোদ্দা কথা, তারা খোলাসাভাবে বুঝিয়ে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপনাদির মাধ্যমেও এ বক্তব্য স্পষ্টতঃ সামনে তুলে ধরেছেন এবং পত্রাদির মাধ্যমেও। তাছাড়া বিশেষভাবে তারা দোয়ার জন্যে আবেদন করেন। সমগ্র বিশ্ব-আহমদীয়া জামা'তকে অনুরোধ করছি তারা যেন বাংলাদেশ জামাতকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখেন। এবং মুসলিম জাহানকে নিজেদের দোয়াতে স্মরণ রাখুন। কেননা আহমদীয়াতের উপর তাদের পক্ষ থেকে যতই আঘাত পড়ে, এর ফলশ্রুতিতে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তো অনেক অনেক উন্নতি দেন কিন্তু মুসলিম জাহানের উপর এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আঘাত আসে এবং এর ক্ষয়-ক্ষতি অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ীরূপে প্রতিফলিত হতে থাকে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভঙ্গের যে বেদনাদায়ক ব্যাপার ঘটে তার পূর্বে অনুরূপ দৃশ্যপটে আহমদীদের মসজিদসমূহ জ্বালানো ও বিধ্বস্ত করা হয়েছিল ও আহমদীদের সম্পদ ধ্বংস ও বরবাদ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে আহমদীদের কেন্দ্রীয় মসজিদেও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালান হয়েছিল। তারা এ সব ব্যাপারকে ভুলে যায়। আর চিন্তাও করে না যে, এ যে এমন একটি ঐশী ধারা যা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তোমাদের উপদেশ প্রদানের বা ঐ বিষয়টি বুঝাবার উদ্দেশ্যে নীরব ভাষায় অব্যাহত থাকে এবং পাপজনিত ফল আনয়ন করে। অন্যায় ও অসঙ্গত ক্রিয়ার কুফল ও শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হয়। কিন্তু আফসোস, মানুষে তা দেখে না এবং শিক্ষণীয় বিষয়টি বোঝে না। হযরত মূসা (আঃ)-এর যামানায় পরম্পরা (অনুরূপ) নয়টি নিদর্শন তাদেরকে তিনি দেখিয়ে

ছিলেন অর্থাৎ খোদাতা'লার তরফ হতে। আর প্রতিবারই তাদের যে ভুল হচ্ছে তা তাদের খুব অল্পই বোধগম্য হতো। কিন্তু তারপর আবারও সেই পুরোনো কথাবার্তা, আবারও সেই কার্যকলাপ, এমন কি ঐ সমগ্র জাতি খোদার দৃষ্টিতে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ যারা জলে ডুবে গিয়েছি তারা তো বটেই, আর যারা বেঁচে ছিল তারাও খোদাতা'লার দৃষ্টিতে ডুবে গিয়েছিল। এর থেকে জাতিবর্গের উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা, শিক্ষা গ্রহণের জন্যে খোদাতা'লার কাছে সেই অন্তর্দৃষ্টি প্রার্থনা করা। আল্লাহ্‌তা'লাই সে দৃষ্টি প্রদান করেন। নচেৎ খালি চোখে তো কিছুই দেখা যায় না। ঐ সব ক্রিয়া-কাণ্ডই বাংলাদেশেও করানো হচ্ছে যা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেজন্যে বাংলাদেশ জামাতকে বিশেষ দোয়ায় স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্‌তা'লা হিফাযত করুন।

মোট কথা, উদ্ভূত পরিস্থিতি হতে এর যে তকদীরই প্রকাশিত হবে সেক্ষেত্রে একটি নির্ঘাৎ ও অব্যর্থ বিষয় হলো এই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্বপক্ষে কল্যাণের সুফলই প্রকাশিত হবে। এ তো জামাত বহু বারই প্রত্যক্ষ করেছে। এক বার, দু'বার নয়, বরং আহ্‌মদীয়া জামাতের শত বছরের ইতিহাস এ বিষয়টি জগতের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ জামাতকে যত ক্ষুদ্র করার চেষ্টা করবে ততই ইহা বৃহত্তর হয়ে বেরুবে। যতই দুর্বল করার চেষ্টা করবে ততই শক্তিশালী হবে। যতই এর নাম মিটাবার চেষ্টা করবে ততই এর নাম বিস্তার লাভ করতে থাকবে। অতএব, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার এমনই এক তক্‌দীর ও সুন্নত যা পরিবর্তন করার বা মিটাবার শক্তি দুনিয়ার কারও নেই। তবে এই পথে দুঃখ-কষ্টও বরণ করতে হয়। "ইল্লা আযান"—এর বিষয়বস্তুও স্বয়ং কুরআন করীমই বর্ণনা করেছে অর্থাৎ কিছু না কিছু দুঃখ-কষ্ট তো তোমাদের স্পর্শ করবে। অতএব, যদি এই পথে দুঃখ-কষ্ট তোমাদের তক্‌দীরে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহ'লে আল্লাহ্‌ যেন আমাদের অন্তঃকরণকে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করেন। সাহস প্রদান করেন যাতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে গিয়ে দুঃখের যে সব কাঁটা এ পথে রয়েছে সেগুলোর কষ্ট ও পীড়া এবং তাঁর সন্তোষ লাভের জন্যে হাসিমুখে মাথা পেতে গ্রহণ ও বরণ করতে পারি। আর এই পথে যে কল্যাণ ও আশিস সম্মুখে আমাদের জন্যে অপেক্ষমান আছে আল্লাহ্‌-তা'লা যেন তা বাড়াতে থাকেন এবং কদমে কদমে যেন আহমদীয়াতের পদচুম্বন করে। বাংলাদেশের জামাতকেও আমি এই ব্যাপারে স্বস্তির আশ্বাস দিচ্ছি। সাধ্যমত যা চেষ্টা করার তা অবশ্যই করুন। ফয়সালা তাই হবে, যা আল্লাহ্‌র তক্‌দীরে চাইবে। ফয়সালায় যদি কোন অকল্যাণও থাকে তাহ'লে নির্ঘাৎ ও নিশ্চিৎরূপে ঐ অকল্যাণের গর্ভ থেকে আপনাদের জন্যে কল্যাণ ও আশিসের ফল্গুধারা ফুটে বেরুবে এবং স্পষ্ট ও বৃহৎ হয়ে সে কল্যাণই আপনাদের এবং জগদ্বাসীর কাছেও এরূপ প্রস্ফুটিত হবে যে, তা আর লুকান-ছাপান ব্যাপার হয়ে থাকবে না যা মানুষকে চেষ্টা করে অন্যদের জানাতে হয় যে, 'দেখ, আমাদের উপর এই ফযল হয়েছে'। সে ফযল (ঐশী কৃপা) তো তখন আপনা আপনিই কথা বলে। নিজেই নিজেকে দেখায়। অতএব, আশা করি, ইনশাআল্লাহ্‌ বাংলাদেশ জামাত এ কথা-গুলো শ্রবণ করে শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ করবে। তারা চেষ্টা-তদ্বীর যেটুকুই করছে তার চেয়েও দোয়ার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হবে।"

(ভূউপগ্রহের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত খোৎবা থেকে)

অনুবাদ : মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

পত্র-পত্রিকা থেকেঃ

ধর্মীয় স্বাধীনতা

"সম্প্রতি একটি মহল সোচ্চার হয়েছে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে। তারা এ লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ-মহাসম্মেলন করছে আর ঘোষণা করেছে নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচী। তাদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে 'কাদিয়ানী'-দের অপসারণও রয়েছে।

বিষয়টিতে যে কোনো শান্তিকামী নাগরিকের মনেই উদ্বেগ সৃষ্টি হতে বাধ্য। জামাতে ইসলামীর আদর্শিক নেতা মাওলানা মওদুদী পাকিস্তানে প্রথম আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম আখ্যা দিয়ে তাদের খতম করার ফতোয়া দেন, তা থেকে ঘটে যায় এক বড়ো রক্তক্ষয়ী প্রাণঘাতী দাঙ্গা।

বছরখানেক আগে ঢাকার বখ্‌শিবাজারে এবং রাজশাহীতে এই সম্প্রদায়ের মসজিদে জামাতে ইসলামীর মদদপুষ্ট লোকজনের হামলায় ইমামসহ অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন, পুড়ে যায় পবিত্র কোরআনসহ নানা বইপুস্তক, আসবাবপত্র।

একটি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের উপর এই চাপ সৃষ্টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। আসলে ১৯৭১ পাকিস্তান বাহিনীর দোসর স্বাধীনতার শত্রু ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সর্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী গোলাম আযম সম্প্রতি প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছেন। তার উপর থেকে জাতির দৃষ্টি সরিয়ে এবং ঘোলা পানিতে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করাই এই 'কাদিয়ানী' বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলে অনেকের ধারণা। গোলাম আযমের প্রথম প্রকাশ্য সভায়ও 'কাদিয়ানী'দের বিরুদ্ধে বক্তারা সোচ্চার হয়েছেন।

এই আন্দোলন বাংলাদেশের সংবিধানেরও পরিপন্থী। সংবিধানের ৪১ (১) (ক) ধারা প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। ৪১ (১) (খ) ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

'কাদিয়ানী' বিরোধীরা সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে কাদিয়ানীদের অপসারণের দাবি তুলেছেন। কিন্তু সংবিধানের ২৯ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'

আমরা দেশে যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা-বিশৃংখলা সৃষ্টির বিরোধী। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সেই শান্তিই যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে তার ফলে ইসলামের মূল অভিপ্রায়ও আহত হয়। বিদায় হজ্বের বাণীতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলে গেছেন, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি ধর্মের ভেতরে রয়েছে নানা দল-উপদল, নানা মতবাদ, নানা সম্প্রদায়। এসব নিয়ে রাষ্ট্র যদি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তা কেবল হানাহানিই ডেকে আনবে। আমরা চাই, ধর্ম-সম্প্রদায়-মতবাদ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক তার মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে নিরাপদভাবে বসবাস করুক। ভেদচিন্তার বদলে সমাজে বিরাজ করুক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। অন্ধকারের শক্তি তা চায় না; তারা চায় না এগিয়ে যাক এই সমাজ, এই রাষ্ট্র। এদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে"।

(সম্পাদকীয়ঃ ৩০-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে জামাতের নতুন ষড়যন্ত্র

শাহরিয়ার কবীর

"পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জামাতে ইসলামীর শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলাদেশের জামাতি নেতারা ঘোষণা করেছেন এখন থেকে বাংলাদেশ হবে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করার জন্য বর্তমানে জামাতে ইসলামী এমন সব ভয়ঙ্কর তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে একটি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ, যার পাঁয়তারা জামাতীরা দীর্ঘদিন যাবৎ করছে। জামাতীরা এটা ভাল-ভাবে জানে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা কোন দিনই ক্ষমতায় যেতে পারবে না। যে কারণে জামাতের আদিগুরু মওদুদী এই দলটির প্রতিষ্ঠালগ্নেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে গিয়ে বলেছিলেন, '.....এ জন্যই আমি বলি যেসব পরিষদ কিংবা পর্লামেন্ট বর্তমান যুগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এ সবের সদস্য হওয়া হারাম এবং তার জন্য ভোট দেওয়া হারাম'।

নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে পারবে না এটা জানা সত্ত্বেও এবং তাদের মহাগুরু মওদুদীর ফতোয়া জারির পরও জামাতীরা এদেশের সরল মানুষদের এইসব 'হারাম' কাজ করতে প্রলুব্ধ করেছে যেভাবে শয়তান প্রলুব্ধ করে বনি আদমের। মওদুদীর আদর্শ দর্শন ছিল হিটলারের নাৎসিবাদ ও মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ। তাঁর মতে যেসব জামাত কোন শক্তিশালী আদর্শ ও সজীব সামগ্রিক (ইজতেমায়ী) দর্শন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তারা সব সময়ই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিরাট বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করে থাকে।..... মুসোলিনির ফ্যাসি পার্টির সদস্য হলো মাত্র চার লাখ এবং রোমে মার্চ করার সময় ছিল মাত্র তিন লাখ। কিন্তু এই সংখ্যালঘিষ্ঠরা সাড়ে চার কোটি ইটালীয়দের উপর ছেয়ে গেছে। এই অবস্থা জার্মানীর নাজী পার্টিরও। (উদ্ধৃতি: 'মওদুদী চিন্তাধারা,' মাওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা-১৯৬৯)

ফ্যাসীবাসী দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধাবোধ কখনই ছিল না। দেশের ব্যাপক জনগণের আশা আকাঙ্খা ও শক্তির প্রতি অনাস্থা ও ঘৃণা তাদের যৌক্তিকভাবে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রতিপক্ষের সারিতে, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জামাতী নৃশংসতার প্রেরণা এসেছে হিটলার ও মুসেলিনির কর্মকাণ্ড থেকে। ব্যতিক্রম ছিল এইটুকু—জামাতীরা ফ্যাসীবাদ ও নাৎসিবাদের ওপর ইসলামের নামাঙ্কিত এক আলখাল্লা পরিয়ে দিয়েছে, যাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতারিত করা যায়।

এদেশের বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদরা অবশ্য এই দলটিকে তার জন্মলগ্নেই সনাক্ত করেছিলেন ইসলামের চরম শত্রু হিসেবে। উপমহাদেশের খাতনামা পীর ও ওলামায়ে কেরাম এদের আখ্যায়িত করেছেন 'ভ্রান্ত' 'বিপথগামী', 'গোমরাহ', 'পাপী', 'বাতিল ফেরকা', 'মোনাফেক', এবং 'বিপজ্জনক', শক্তি হিসেবে। জামাতীদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সঠিকতা খোদ জামাতীরাই বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ করেছে। কখনও তারা জামাতে ইসলামী আর পাকিস্তানকে বানিয়েছে ইসলামের সমার্থক হিসেবে (যেন জামাত বা পাকিস্তানের জন্মের আগে পৃথিবীতে ইসলাম ছিল না!) কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে কখনও স্বয়ং আল্লাহ্‌কে বানিয়ে দিয়েছে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে পাকিস্তান আর জামাতই হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক যাদের অবস্থান হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের বিরুদ্ধেও বটে। পাকিস্তানকে বা জামাতকে আঘাত না করলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না বলেই পাকিস্তান ও জামাত একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল জনগণের বিরুদ্ধে।

একাত্তরে পরাজিত হয়েও তারা পরাজয় মানেনি। জামাতীরা যখন বুঝে গেছে ভাঙা পাকিস্তানকে জোড়া দেয়া আর সম্ভব হবে না, তখনই তারা লিপ্ত হয়েছে বাংলাদেশকে একটি মিনি পাকিস্তান বানাবার ষড়যন্ত্রে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধাচরণ, জাতীয় পতাকার অবমাননা, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক চিহ্নরসমূহ ভেঙে ফেলা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র-জনতার উপর ফ্যাসবাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করা, হাতপায়ের রগ কেটে দিয়ে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া, পাকিস্তানী ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে অস্ত্র অর্থ এনে কর্মীদের গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া, সার্কুলার জারি করে সামরিক বাহিনীতে দলীয় কর্মীদের পাঠানো, ইসলাম রক্ষার জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো—এ সবই হচ্ছে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার অন্তর্গত।

দু'বছর আগে বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন করে জামাতীরা পাকিস্তানী নাগরিক যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করে এদেশের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বকে উপহাস করে একটি ঘৃণ্য চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে। তাৎক্ষণিকভাবে জামাতের প্রতি জনগণের স্বতস্ফূর্ত ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ; ছাত্র, যুব, নারী, মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পেশাজীবীদের ফোরামসহ দেশের বরণ্যে নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে। যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ফাঁসি এবং ফ্যাসিষ্ট ঘাতক জামাত-শিবির চক্রের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে জাতীয় সমন্বয় কমিটির

আন্দোলন গত বাইশ মাসে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর অর্থ, উৎকোচ ও প্রলোভনের বিনিময়ে জামাতীরা গোপনে ষড়যন্ত্রের সংগঠনিক জাল বিস্তার করে যেভাবে দলের শক্তিবৃদ্ধি করছিল তা সম্পূর্ণভাবে রুখে দিয়েছে একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই আন্দোলন। যে জামাতীরা '৯১-এর সংসদে নির্বাচনে ১৮টি আসন লাভ করেছিল। '৯৩-এর পৌরসভা নির্বাচনে একটি আসনও যে লাভ করতে পারেনি, তার কারণ এই ফ্যাসিষ্ট ঘাতকদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান ঘৃণা ও ক্ষোভ। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে কোণঠাসা জামাতীরা বদ্ধ ঘরে আটকে পড়া বেড়ালের মত মরিয়া হয়ে উঠেছে। গত বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অকারণে হামলা চালিয়ে, ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার অজুহাতে এদেশের নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লোকজনকে প্ররোচিত করে, দেশবরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে তাঁদের ফাঁসির দাবি তুলে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা তারা কম করেনি। এতকিছু সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ভিতর জামাতের অতীত ও বর্তমান দুষ্কর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি।

জামাতে ইসলামী নাম নিয়ে যখন আর জনগণকে ইসলামের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না তখন জামাতীরা ভিন্ন এক কৌশল অবলম্বন করেছে। সম্প্রতি তারা তাদের অনুসারী কিছু মাওলানাকে দিয়ে 'আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওতে বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে তাদের পুরোনো রক্তপিপাসু রাজনীতি প্রচারের আয়োজন করেছে। পাকিস্তানের মুলতানভিত্তিক এই '.....খতমে নবুয়ত'-এর বাংলাদেশ শাখার আমীর হচ্ছেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক। এই মাওলানা এক সময়ে জামাত বিরোধী ছিলেন। বছর পাঁচেক আগে জামাত সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ছিল, '.....জামাতে ইসলামীর চিন্তাধারা আকিদা এবং কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, মুফতি মোঃ শফি, মাওলানা মোঃ ইউসুফ বিন নূরী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাফাযী প্রমুখ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ সমালোচনা করে এসেছেন এবং বিভিন্ন বই পুস্তকের মাধ্যমে জামাতের মতাদর্শগত আকিদাগত ভুলত্রুটি চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা এ সকল বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিজ মত ও পথের কোন পরিবর্তন করতে কখনও রাজি হয়নি।...এসব ভ্রান্ত ধারণার ব্যাপারে আমি কোন নতুন মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করি না। বরং উপমহাদেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরামগণ, যারা ইসলাম সম্পর্কিত জামাতে ইসলামের ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা, প্রতিবাদ করে আসছেন, তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি'। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ১৩ জানুয়ারী ১৯৮৯)।

'উপমহাদেশের যেসব বরেণ্য আলেমের সঙ্গে আমাদের খতিব সাহেব একাত্মতা প্রকাশ করেছেন জামাতে ইসলামী সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হচ্ছে সাহারানপুর থেকে মওদুদী ফেতনা নির্মূল করে দাও। মওদুদী আন্দোলন ধ্বংসসাধনকারী ও জীবন সংহারক বিষ। মওদুদী অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। তাদের পিছনে নামাজ পড়বে না।' (মাকতুবাতে শেখুল ইসলাম প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫৬। উদ্ধৃতি মওদুদী চিন্তাধারা, মওলানা আবদুল আউয়াল) মওদুদী জামাত.....সাধারণ মানুষের ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতা ডেকে আনে। (মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা মুফতি কেফায়েত উল্লাসহ উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় আলেমদের বিবৃতি দৈনিক আল জমিয়ত, ৩০ আগষ্ট ১৯৫১। উদ্ধৃতি: প্রাগুক্ত) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি হযরত মওলানা সৈয়দ মাহদী হাসান জামাতে ইসলামী সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন, 'এই আন্দোলনে মুসলমানদের শরিক হওয়া কখনও উচিৎ হবে না। এটা তাদের জন্য জীবন সংহারক বিষ। মানুষকে এই আন্দোলনে শরিক হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। নতুবা তারা গোমরাহ হয়ে যাবে।.....শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ মোটেও জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি এই জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রচার প্রসার করে সে কল্যাণের পরিবর্তে পাপ কাজ করে। সে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারে না। এবং মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকে। যদি কোন মসজিদের ইমাম মওদুদী সাহেবের সমমনা হয় তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়া মকরুহ'। (উদ্ধৃতি: প্রাগুপ্ত)।

জামা'তে ইসলামের আসল চেহারা উন্মোচন করে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমেরা এ ধরনের বহু ফতোয়া দিয়েছেন যা একত্র করলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বই হবে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হক জামাত বিরোধিতায় এদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে কোন কারণে হঠাৎ জামাতপ্রেমী হয়ে তাদের মঞ্চে গিয়ে উঠলেন সেটা অবোধগম্য নয়। জামাত কোন কায়দায় মানুষকে তাদের দলে যোগদানে প্রলুব্ধ করে এটা দেশবাসী জানেন।

ঢাকায় খতমে নবুয়তের সম্মেলন আয়োজন করার বিষয়ে শলাপরামর্শ করার জন্য এ মাসের প্রথম দিকে মওলানা উবায়দুল হক পাকিস্তান গিয়েছিলেন। লাহোরের উর্দু দৈনিক 'পাকিস্তান'-এর ৫ ডিসেম্বর তারিখে খবর বেরিয়েছে—আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশ-এর আমীর মওলানা উবায়দুল হক করাচী পৌঁছে গেছেন। এখানকার কেন্দ্রীয় দফতরে করাচী জামাতের আমীর মওলানা সাঈদ আহমেদ, নাজিমে আলা মওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার ফারুকী, খতমে নবুয়তের মুবাল্লেগ মওলানা মুহাম্মদ নযর উসমানী, হাফেয মুহাম্মদ হানিফ নাদিম ও আল্লামা ইমরান যাকী তাকে স্বাগত জানান। তিনি

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে মজলিসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়তের নায়েব আমীর শাইখুল হাদিস মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানী, জাষ্টিস তাকি ওসমানী, মওলানা মুহাম্মদ রাফি উসমানী, ডাঃ হাবীবউল্লাহ বখতিয়ার, সৈয়দ মুহাম্মদ বান্নুরী, ডাঃ আবদুর রাজ্জাক সিকান্দার, মওলানা সলিমুল্লাহ খান প্রমুখের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন'। ইতিমধ্যে জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, যিনি '৭১ সালে খুনী আলবদর বাহিনীর হাই কমাণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন, এই সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনটি যদি নিছক ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল হতো তাহলে কারও আপত্তির কারণ থাকতো না। সমস্যা হচ্ছে এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে জামাতীদের মর্চে পড়া পুরোনো রাজনৈতিক হাতিয়ার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিটিকে শান দেবার জন্য যাতে করে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে যেভাবে তারা নিরীহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হাজার হাজার শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ হত্যা করেছিল এখানেও তেমনটি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়। এ কথা বহুবার বলা হয়েছে, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এমনকি অতীতের কমিউনিষ্ট দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা গণচীনেও প্রত্যেক মানুষের নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত ছিল। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদেও মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পাকিস্তান, সেখানে জিয়াউল হকের বর্বর সরকার জামাতে ইসলামীর প্ররোচনায় কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়েছে। ঘৃণিত হয়েছে নিজ দেশসহ অন্যান্য দেশের বিবেকবান মানুষদের কাছে এবং তাদের দুর্ভাগ্যজনক পতনও আমরা দেখেছি।

যে জামাতে ইসলামী কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে উপর্যুপরি দাঙ্গা বাধিয়েছে, নরহত্যা করছে, ঘরবাড়ি মসজিদ ভাংগচুর করছে, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান পুড়িয়েছে, সেই জামাতীদের বাতিল ফেরকার অনুসারী হিসেবে যারা ফতোয়া দিয়েছেন তাঁরা সবাই সুন্নী মুসলমান, উপমহাদেশের বরেণ্য আলেম সম্প্রদায়, কেউ কাদিয়ানী নন। ধর্মচ্যুত জামাতীরা, নিজেদের যারা প্রমাণ করছে নৃশংসতম নরহত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারী, সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে—তারা কোন অধিকারে ইসলামের কথা বলে ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করছে এ প্রশ্ন যে কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানই করতে পারেন।

দেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব সাহেব সর্বস্তরের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বেতন গ্রহণ করে কোন যুক্তিতে জামাতে ইসলামীর মত 'জীবন সংহারক বিষ তুল্য'

একটি ফ্যাসিষ্ট রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন, কোন যুক্তিতে তিনি মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, কেন তিনি জেনে শুনে গোমরাহীর পথ অনুসরণ করে সরকারী মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিবের পদ আঁকড়ে ধরে বসে আছেন এসব প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার নিশ্চয় এ দেশের করদাতা জনসাধারণের রয়েছে, বিশেষ করে যারা এই মসজিদে নামায আদায় করেন তাদের তো বটেই।

সরকারী দলের মন্ত্রীরা যখনই সুযোগ পান তখনই বলেন বাংলাদেশে এখন এমন এক গণতন্ত্র রয়েছে যা কি না অতীতে কখনও দেখা যায় নি। সবাইকে তারা নসিহত করেন গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলতে। যে জামাতী ইসলামীকে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারী দলের সংসদরা পর্যন্ত ফ্যাসিষ্ট ঘাতকদের দল হিসেবে আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন সেই দলের একনিষ্ঠ অনুগামী বায়তুল মোকাররমের খতিব যখন জামাতীদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় এদেশে গৃহযুদ্ধ বাধাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন তার বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা কোন যুক্তিতে নেয়া হবে না এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান দেশের প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এই সংবিধান কোন দল বা রাষ্ট্রকে অধিকার দেয়নি মানুষের এই মৌলিক অধিকার হরণ করার। পাকিস্তান পাবন্দ ফ্যাসিষ্ট জামাতে ইসলামী উপর্যুপরি সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন করে চলেছে। ক্রমাগত তারা আঘাত হানছে মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জনসমূহের ওপর, হুমকি দিচ্ছে গৃহ যুদ্ধ বাধাবার। ক্ষমতাসীন সরকার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিধ্বংসকামী সংবিধান লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অবশ্যই তারা নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে"।

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক জন কণ্ঠের সৌজন্যে)

শিশু শিক্ষার ছাব্বিশটি মূলতত্ত্ব

মূল : হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

অনুবাদ : মোরতোজা আলী

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(২৪) শিশুদের জিনিস যেন একত্রীভূত হয়। যেমন শিশুদিগকে একটি খেলনা দিয়া বলা উচিত যে ইহা সকলের জন্য। সকলে মিলিয়া খেলা কর, নষ্ট করিও না। এইরূপে তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি সংরক্ষণের ভাবের উদয় হয়।

(২৫) শিশুকে শিষ্টাচার ও সভ্যতার রীতি-নীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(২৬) শিশুকে ব্যায়াম ও পরিশ্রম করানো উচিত। কেননা ইহা পার্থিব উন্নতি ও আত্মশুদ্ধি উভয় দিক দিয়াই লাভদায়ক।

('মিনহাজুত্তালেবীন' গ্রন্থ হইতে অনূদিত)

এটি শুভ লক্ষণ নয়

হারুনুর রশীদ খান

"মৌলবাদীরা যে কোন ছলছুতোয় ইস্যু তৈরী করতে চাইছে। জনগণের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার অপপ্রয়াসে তারা লিপ্ত। এক্ষেত্রে মৌলবাদীদের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন-দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে সমগ্র মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে তথাকথিত জেহাদের নামে সংঘর্ষের সৃষ্টি করা, দাঙ্গা বাধানো, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরী করা।

গত ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়তের মহাসমাবেশে যে সব কথা উচ্চারিত হয়েছে, যে শ্লোগান তোলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক সরকারকে যেভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে, তা কোনভাবেই শুভ লক্ষণ নয়। এই মহাসমাবেশ থেকে বলা হয়েছে, 'আগামী দুই মাসের মধ্যে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা দিতে হবে। নতুবা বিএনপি সরকারকে 'কাদিয়ানিদের' সরকার বলে ঘোষণা দেয়া হবে।' সমবেশে বক্তারা ফতোয়া দেন কাদিয়ানিদের দেখলেই কাফের বলে সম্বোধন করবেন। সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক।

আমার অবাক লাগে দেশের জাতীয় মসজিদের খতিব কিভাবে বারবার রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজেকে জড়িয়ে নেন। এর আগে তিনি একবার বিতর্কিত হয়েছিলেন যুদ্ধাপরাধী কুখ্যাত গোলাম আযমের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে। এরশাদ সরকার যেখানে বায়তুল মোকাররম মসজিদ এলাকাকে রাজনীতি মুক্ত রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেখানে গণ-তান্ত্রিক সরকারের আমলেই বিতর্কিত গোলাম আযম ও তার সাগরেদদের শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মসজিদ অঙ্গনে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়ে এবং মাওলানা ওবায়দুল হক নিজেও সেখানে বক্তব্য রেখে বিতর্কিত হন। তখন স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি তাকে ইমামের পদ থেকে অপসারণের দাবী জানিয়েছিল। যাই হোক মানিক মিয়া এভিনিউতে সেদিনের মহাসমাবেশে যেসব কথা উচ্চারিত হয়েছে তা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে একটি নতুন ইস্যু তৈরী করার উদ্যোগ বলেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। বিভিন্ন দেশ থেকে নিজেদের লাইনের লোকজনদের টেনে এনে আন্তর্জাতিক ফোরাম তৈরী করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার এই প্রবণতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্রদায়কে অমুসলিম কিংবা কাফের ঘোষণা করার উদ্যোগটি কোনভাবেই ধর্মপ্রাণের নমুনা নয়। কোরান কি বলে অতো গভীর বিষয় আমি জানিনা, এনিয়ে আমি তেমন কিছু ব্যাখ্যায়ও যেতে চাই না, কারণ এটা আমার অক্ষমতা। তবে যে মহানবীর উম্মত আমরা তিনি কিন্তু কাউকে কাফের ঘোষণা দূরের কথা বরং একজন কাফেরকে দ্বীন ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করেছেন, কাফেরদের শত

অত্যাচার সহ্য করেও তিনি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন, ইসলামে হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা হিংস্রতার কোন স্থান নেই। বরং একজন মানুষ তিনি কাফের হলেও ভালবেসে বুঝিয়ে ইসলামের অনুসারী করে তোলার নিরলস সংগ্রাম ছিল মহানবীর। অবাক লাগে, যেখানে ১৪০০ বছরের বেশী আগে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে একজন কাফেরকে ইসলামের শিক্ষায় দীক্ষিত করে মুসলমান বানাতে চেয়েছেন, আজ আধুনিক পৃথিবীতে সেই ইসলামের অনুসারী মুসলিম জাতিকে সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত করে 'কাফের' সম্বোধন করার ফতোয়া দেয়া হয়। পাশাপাশি একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে হুমকি দেয়া হয়—তাদের দাবী মেনে না নিলে সরকারকেও তাদের ভাষায় কাদিয়ানি বলা হবে, প্রকারান্তরে এখন থেকে দু'মাসের ব্যবধানে সরকারকে 'কাফের' বলা হবে। এটা এক ধরনের ঔদ্ধত্য। গত ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবারের সমাবেশে পাকিস্তান-ভারত থেকেও প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের টাইটেলধারী দেড় ডজনের বেশী মাওলানারা বক্তব্য রাখেন। জামাতে ইসলামীর মাওলানা আবদুস সোবহান এম পি এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হবার কিছুক্ষণ পরই দু'দফায় মাইকে ইংরেজী গান বেজে উঠে। তখন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়—কোন গাড়ির ইংরেজী গান আমাদের মাইকে ঢুকে পড়েছে। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। মাইকের নিয়ন্ত্রণ যেখানে মঞ্চ থেকে, সেখানে 'মাউথ পিসে' কিভাবে গাড়ির গান ঢুকে পড়তে পারে? আসলে উদ্যোক্তাদের এই জঙ্গী হঠকারী ব্যাপারটিকে বিদ্রুপ করার জন্যই যেকেউ এমন কাজ করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের সবচেয়ে চালাক মনে করেন, বাকী জনগণ সব বেকুব আর কি। শায়খুল হাদিস বলে পরিচিত (আমি এই টাইটেলের অর্থ আজও খুঁজে পাইনি) মাওলানা আজিজুল হক বলেন—আমরা সরকারের কাছে ফতোয়া ভিক্ষা করছি না। সরকার যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তবে কাদিয়ানিদের কাফের ঘোষণা করতে হবে। সরকার নির্বোধ। তারা আইন জানেনা। কাদিয়ানিরা মুসলিম শব্দ ব্যবহার করে আমাদের 'গুড উইল' ব্যবহার করছে। বকশিবাজারে সাইন বোর্ড লাগিয়েছে। সেখানে কি একটা বানিয়ে তাকে মসজিদ বলছে। সরকারকে শুধু অমুসলিম ঘোষণা দিলেই চলবে। তারপর দেখবো ওরা কিভাবে সাইন বোর্ড ব্যবহার করে সে দায়িত্ব আমাদের। চরমোনাইর পীর ফজলুল করিম বলেন—শুধু কাদিয়ানিরা নয়। তসলিমা নাসরিন গং বিবৃতি দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এদের নিষিদ্ধ করতে সরকারের আপত্তি কেন। তারা জনগণের সরকার নাকি কাদিয়ানিদের সরকার? সরকার কুবুদ্ধির বসে আজকের সমাবেশে বাধা দেয় নি। বাঁধা দিলে লোকজন জখম হতো ও হাঙ্গামা হতো। তাতে আন্দোলনে আমরা আরো কামিয়াব হতাম।'

এ ধরনের অনেক কথাই উচ্চারিত হয়েছে সমাবেশে। তবে আমি আশংকিত এসব

ফতোয়াবাজ মাওলানারা ইসলামের নামে যে বিভেদ ও সংঘর্ষ তৈরী করতে চাইছে, তাতে যে কোনভাবেই তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকারকে, আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেছে। সেই একই মঞ্চে বিএনপির একজন সংসদ সদস্য আতাউর রহমান বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন 'কাদিয়ানিরা কাফের। এ ব্যাপারে নতুন কিছুই বলার নেই। জনগণের নির্বাচিত সরকারকে এ দাবী মানতে হবে। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আমি ৯২ সালের ৪ অক্টোবর সংসদে এ ব্যাপারে একটি বিল জমা দিয়েছি। স্পীকার, সরকার প্রধান, সংসদের উপনেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলি-দেয়ালের লিখন পড়ুন। আর জনতাকে বলি বিল পাসের জন্য আপনারা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন।'

আমার কেন জানিনা সন্দেহ হয়, এটা একটা খেলা। কারা এই খেলা খেলছেন তা বুঝতে হবে। যে মঞ্চ থেকে বিএনপির গণতান্ত্রিক সরকারকে হুমকি প্রদান করা হচ্ছে, একই মঞ্চে আসন গ্রহণ করে বক্তৃতা করেন বিএনপির একজন এম পি। তিনি স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেয়ালের লিখন পড়তে বলেন। এ ধরনের উপদেশ সরকারকে সাধারণত বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ দিয়ে থাকেন। সরকারী দলের একজন সদস্যের এই ভূমিকা কি একটা সন্দেহের উদ্রেক করে না? উদ্যোক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কথা দিয়েও এই সমাবেশ উদ্বোধন করতে রাজী হননি। মঞ্চ থেকে সরকার বিরোধী বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে শুধু নয়, সময় সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, যদি দু'মাসের মধ্যে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা না দেয়া হয় তা হলে বিএনপি সরকারকেও কাদিয়ানি অর্থাৎ তাদের ভাষায় 'কাফের' বলা হবে। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের সাথে একমত হলেন কি করে একজন বিএনপি এম পি। তার খুঁটির জোর কোথায়? তা হলে কি আমি ধরে নেব বিএনপি'র রক্ষণশীল অংশের সমর্থনেই তিনি এই মহাবেশে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন?

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের সমালোচনা আমরা করতে পারি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। সেটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু খালেদা জিয়ার সরকার 'অমুসলিম' এটা বলার দুঃসাহস পেলেন কোথায় এই মৌলবাদীরা? অসৎ দুঃসাহস সব সময় পেছন থেকেই কাজ করে। প্রধানমন্ত্রীকে এটা বুঝতে হবে। উল্লেখিত মহা সমাবেশের একদিন পরেই সায়েদাবাদে এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম বলেছেন, আমাদের বিরোধীদের প্রতি বিদ্বেষ দেখাবেন না। তাদেরকে ভালবাসুন। তাদের বিরোধিতার কারণেই গত দু'বছরে সারাদেশে জামায়াতের পরিচিতি বেড়েছে। তারা আসলে আমাদের উপকারই করেছেন। আমাদের বিরোধিতাকারীরা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী। আমরা ধর্ম কিংবা রাজনীতি নিরপেক্ষ নই। আমরা ধর্ম ও রাজনীতির উভয় পক্ষে রয়েছি। দেশে ইসলামের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। গোলাম আযম আরও বলেন—গত ইলেকশনে বিএনপিকে সমর্থন দেয়ার সময় আমরা ইচ্ছে করলে ৫টি মন্ত্রিত্ব চাইতে পারতাম।

চাইনি বলে অনেকে আমাকে বোকা বলেছে।'

একই অনুষ্ঠানে মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন—'কাদিয়ানিদের 'ওআইসি'সহ সকল মুসলিম দেশ অমুসলিম ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ বিএনপি সরকার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

মূলতঃ ঢাকার সেদিনের মহাসমাবেশের মূল শেকড় কোথায়, তার সন্ধান মেলে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য থেকে। মৌলবাদীদের প্রধান দল জামায়াত যে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির চাপের মুখে কোণঠাসা হয়ে নতুন করে দেশে অরাজকতার পথ হিসেবে কাদিয়ানি ইস্যু তৈরী করতে চাইছে, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। জামায়াতের এই সমাবেশে একটি অন্তর্নিহিত বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে গোলাম আযমের মন্তব্যে। তাহলো ইলেকশনে বিএনপি দলকে সমর্থন দেয়া। আমরা জানতাম বিএনপি নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, নিরঙ্কুশ নয়। তাই জামায়াতের সমর্থন নিয়ে তাদের সরকার গঠন করতে হয়। কিন্তু গোলাম আযম বলেছেন, তারা নাকি বিএনপি'কে নির্বাচনেই সমর্থন দিয়েছিলেন আর ইচ্ছে করলে ৫ জন মন্ত্রী পেতে পারতেন। কথাটার পরিষ্কার ব্যাখ্যা বিএনপির, গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে জনগণ জানতে চায় বৈকি!

দুই

মতিউর রহমান নিজামীর কথাটা সঠিক নয়, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী কাদিয়ানীদের 'অমুসলিম' ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাকিস্তানে জামায়াত ধর্ম ব্যবসা করে রাজনীতির নামে কাদিয়ানিদের বিরোধিতা করছে দীর্ঘদিন ধরে। তাতে কি ফল হয়েছে? পাকিস্তানেইতো গত সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতের কবর রচিত হয়েছে। আমার কেন জানিনা মনে হয়, সব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে জামায়াত কিংবা তাদের অন্য দেশীয় দোসররা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দুর্বল করে ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে চাইছে।

কাদিয়ানী বিষয় জটিলতার প্রেক্ষিতে বাংলাবাজার পত্রিকা ২৬ ডিসেম্বর আহমদীয়া জামায়াতের ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে বিষয়টিকে অনেকটা পরিষ্কার করেছে। সাক্ষাৎকারে জনাব মোস্তফা আলী বলেছেন—আমরা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে খাতামান নবীঈন মানি। পবিত্র কোরান মজিদের এটা ঘোষণা। খাতামান নবীঈনের যত রকম অর্থ হয়, সব রকম অর্থ মানি। তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী, ধর্মকে পূর্ণাঙ্গকারী হিসেবে বিশ্বাস করি। মহানবীর পরে নতুন ধর্ম ও কলেমা নিয়ে কেউ আসবে না। নতুন কোন শরীয়ত গ্রন্থ নাজেল হবে না। মোহাম্মদী শরীয়তের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না।'

জনাব মোস্তফা বলেন—হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আমরা ইমাম মাহদী (আঃ) বলে বিশ্বাস করি। তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে জন্মলাভকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি মোহাম্মদ (সঃ)-এর গোলাম শিষ্য ও আধ্যাত্মিক অনুসারী। আমরা

বিশ্বাস করি—হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত নবীদের মতো কোন নতুন নবী বা পুরাতন নবী নবী আসবেন না।'

আহমদীয়া জামায়াতের আমির জনাব মোস্তফা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এরপরে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ মানিক মিয়া এভিনিউর সমাবেশে করা হয়েছে, তা ধোপে টেকে না। ইসলামের অনুশাসন অতো সস্তা নয়, যেভাবে জামায়াত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ব্যাখ্যা দিতে চায়। ইসলাম ও মহানবী কাউকে কাফের আখ্যা দেননি বরং কোন কাফেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্যে কাজ করেছেন। সারাবিশ্বে মুসলিম সমাজের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায় আছে। আমরা ইসলাম প্রচারের সূচনা লগ্নে ফিরে গেলেই তার উদাহরণ পাব। ইসলামের মহানবাণী ও দীক্ষা এতোই বিস্তৃত যে এই স্বল্প পরিসরে তার ব্যাখ্যায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমি একটি বিষয় ভাল করেই বুঝি ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম, এখানে হীনমন্যতার কোন দাম নেই। মহানবী নিজে সকল প্রকার হীনমন্যতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামের সুমহান বাণীকে মানব সমাজের মাঝে প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। সেখানে আজ ইসলাম ধর্মকে আশ্রয় করে অন্য ধর্মের সাথেতো বটেই, ইসলাম ধর্মের অনুসারী সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

জনাব মোস্তফা অন্য এক জায়গায় বলেন—যে নিজেকে মুসলমান বলে আমরা তাকে অমুসলমান বলি না। কে প্রকৃত মুসলমান আর কে নয়, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ ফায়সালা করবেন। আল্লাহ কাউকে এ দায়িত্ব হাতে নেয়ার অধিকার দেননি। যদি কেউ তা করে তা খোদার উপর খোদকারী। কোন সরকার এটা ঘোষণা করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্বনবী। সারা বিশ্বে এখনো সোয়া চার শ' কোটি লোক ইসলামের বাইরে। অথচ তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে না দিয়ে নিজেদের মধ্যের কাউকে কাফের বলে বের করে দেয়া আমাদের কর্তব্য হতে পারে না। মহানবী (সঃ) কাউকে কাফের বানাতে পৃথিবীতে আসেননি। অমুসলিমদের কাছে ধর্মের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন।

তিনি বলেন--মানিক মিয়া এভিনিউতে যে সব বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা ইসলাম সমর্থন করে না। তারা সেখানে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। এসব বক্তব্য শুনে কেউ ইসলাম সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেনি, অযথা উত্তেজিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া এক সময় বেদ পড়া নিষেধ ছিল। তারা বলেছেন, ওরা ব্যতীত কেউ কোরান মজিদ পড়তে পারবে না। কিন্তু হৃদয়ে কোরানের অনুরণন ওরা কিভাবে ঠেকাবেন? ওরা শুধু এসব বাহানা করে আমাদের বাহ্যিক কষ্ট দিচ্ছেন। কাদিয়ানির ইস্যু তুলে পাকিস্তানে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ক্ষমতা হাসিলের চেষ্টা চালিয়েছে। এখানেও তেমনি কতিপয় উচ্চাভিলাষী দল ক্ষমতায় যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। ওই সমাবেশে সকল বক্তৃতা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতামুখী। সেখানে একজন পীর সাহেব বলেছেন, এদেশে মোল্লারাও সরকার চালাতে পারেন। এরা শুধু আমাদের ইস্যু করে ক্ষমতা দখলের পথ তৈরী করছে।'

বিষয়টি নিয়ে আমার বিশ্লেষণে যে কথা বলার ছিল, জনাব মোস্তফার সাক্ষাৎকারে তা উঠে এসেছে বলেই তার কথাগুলো এখানে বললাম। মোল্লারা সরকার চালাতে পারে এমন ধারণা এই মৌলবাদীদের মধ্যে রয়েছে। এরা একসময় ইরান ষ্টাইলে বিপ্লব ঘটানোর ডাক দিয়েছিল এই স্বাধীন বাংলাদেশে। যে মুক্তি সংগ্রামে এই মোল্লাদের কোনই অবদান তো ছিল না, বরং বিরোধিতা করেছে।

আজ মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে সুযোগ সন্ধানী মৌলবাদীরা ফায়দা লুটতে চাইছে। আমি কাদিয়ানি বুঝি না, শিয়া, সুন্নী, ওহাবী কোন কিছুই বুঝি না। একটাই কথা বুঝি ইসলাম ধর্ম। যে ধর্মে মানুষ হিসেবে সকলকে উর্ধ্বে তুলে ধরার বিধান রয়েছে, যে ধর্মে অন্য ধর্মাবলম্বীকে সম্মান দেখানোর বিধান রয়েছে, যে ধর্মে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার কোন স্থান নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ। সেই মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়। আল্লাহর সৃষ্টি সকল মানুষই-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। সেখানে হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খৃষ্টান, জৈন কোন বিষয় নয়, সকলেই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ। সেখানে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে হটকারী-ভাবে উস্কানি দেয়া ইসলামের কোন পথ আমাদের জানা নেই।

গণতান্ত্রিক বৃটেনের কথাই ধরি। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখানে দু'টি সম্প্রদায় প্রধান। ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট। বৃটেনের সরকার ও প্রশাসনে ক্যাথলিকদের প্রাধান্য বেশী, তারপরেও প্রটেষ্ট্যান্টরা সেখানে উপেক্ষিত এমন কথা বলা যাবে না। বরং তারা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। প্রটেষ্ট্যান্টরা ক্ষমতায় সংখ্যালঘু হিসেবেও আসেন না, তাওনা। কিন্তু কোন ক্যাথলিক তো কোনদিন বলেননি—প্রটেষ্ট্যান্টরা খৃষ্টান নয়। কিংবা তাদের 'অখৃষ্টান' ঘোষণা করা হোক। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক রয়েছে। সেখানেও বলা হয়নি কোন শিখ বড় ধরনের পদে আসতে পারবে না, বরং সম্প্রতি একজন শিখ অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করার পরেও প্রধানমন্ত্রী তার পদত্যাগ গ্রহণ করতে চাইছেন না। একজন হরিজন পর্যন্ত (কে আর নারায়ণ) উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। তবে হ্যাঁ, হিন্দু মৌলবাদীরা সেখানেও প্রতাপের সাথে বিরাজ করতে চাইছেন কতোটুকু তারা পারবেন, তা অনিশ্চিত। কারণ একটা সময় তাদের উত্থান ঘটতে শুরু করেছিল, যা বর্তমান সময়ে আবার পতন ঘটতে চলেছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙে বিজেপিসহ অন্য উগ্রহিন্দু মৌলবাদীরা জল ঘোলা করেছিল, সারা পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছিল, একটি অরাজকতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিল। আজ বাংলাদেশেও একই ষ্টাইলে কাদিয়ানি ইস্যু করে মৌলবাদীরা তাদের উত্থানের পথ তৈরী করতে চাইছে। আজ কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে হুমকি দিচ্ছে। কাদিয়ানিদের নয়, সরকার যদি দু'মাসের মধ্যে তাদের 'অমুসলিম' ঘোষণা না দেয়, তাহলে কাদিয়ানিরা তো বটেই, তাদের সঙ্গে সরকারও 'কাফের' হয়ে যাবে। এসব মোল্লারা সরকার চালাবার ক্ষমতা রাখে বলেও দাবী করে।

অথচ এইসব মোল্লারা এবং তাদের গুরু জামায়াতে ইসলামী তাদের নেতা গোলাম আযম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের 'কাফের' আখ্যায়িত করে পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও বুদ্ধিজীবী হত্যায় সরাসরি মদদ যুগিয়েছিল, নীলনকশা তৈরী করেছিল। এরা নিজ হাতে মুক্তিযোদ্ধা মুসলমানদের হত্যা করেছে, মুসলমান নারীদের ধর্ষণ ও ধর্ষণে সহায়তা করেছে, বুদ্ধিজীবীদের বাড়ী বাড়ী থেকে ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তা হলে কি এদেশের সব মুসলমানরা একাত্তরে 'কাদিয়ানি' ছিল? ওরা আবার সম্প্রতি বিজয় দিবস পালনের মাধ্যমে নানা ফন্দি ফিকির করে নিজেদের জায়েজ করতে চাইছে। ওদের মুখে যখন 'কাফের' শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন সত্যিসত্যি হাসি পায়। ওরা একাত্তরে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের সমর্থনকারী সকল মুসলমানকে 'কাফের' বলেছিল। তারা লেলিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে ওইসব 'কাফের'দের হত্যা করতে, কাফের মহিলাদের ধর্ষণ করতে। প্রশ্ন থাকে, ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয়?

পাকিস্তানে সবসময়ই সামরিক শাসকরা কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে একটি শ্রেণীকে অর্থাৎ জামায়াতকে কাজে লাগিয়েছে। আবার শিয়া-সুন্নীর সমস্যাও সেখানে রয়েছে। কাদিয়ানিরা যদি হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে ইমাম ভাবেন তাতে দোষ কি? তারাতো মহানবীকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেন। একই সাথে আহমদ কাদিয়ানিকে মহানবীর গোলাম ও শিষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের আরেকটি সম্প্রদায় ইসমাইলিয়ারা যে প্রিন্স করিম আগা খানকে ইমাম হিসেবে মানেন, তাদের বিরুদ্ধে তো মৌলবাদীরা কোন কথা বলেন না। কারণ কি এই যে, ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম তার লোকজন দ্বারা এবং নিজে বাংলাদেশে বিরাট অর্থ লগ্নী করেন এবং সহযোগিতা করেন? আমি এখানে পরিষ্কার অর্থে যা বুঝাতে পারছি, এটা বাংলাদেশে মৌলবাদীদের পাকিস্তানী ষ্টাইলে কাদিয়ানি বিরোধী একটি ইস্যু তৈরী করা। যাতে করে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে বিরোধীদলের সঙ্গে সরকারের সংকট থেকে সমঝোতার পথকে ভিন্নপথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এরা একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ময়দানে নেমেছে। সুপরিকল্পিতভাবেই তারা একটি নতুন ইস্যু তৈরী করেছে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বিএনপি সরকারকে আমি অত্যন্ত Innocent ভাবতে পারতাম, কারণ হুমকি সরকারের বিরুদ্ধেই দেয়া হয়েছে। তা ভাবতে একটু কষ্ট হচ্ছে, একটি Note of Decent এখানে এসে যায়, কেননা সরকারী দলের একজন এম, পি এই মহাসমাবেশে উপস্থিত থেকে গরম বক্তৃতা করেছেন, এমনকি তিনি রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রিয়দর্শিনী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যতটুকু জানি অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির রমণী। তার অঙ্গুলি হেলনে, চোখের ইশারায় এতোগুলো ডঃ, ব্যারিষ্টার, আমলা, ডাঃ, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হিমশিম খাচ্ছেন আর একজন পার্লামেন্ট সদস্যের এতোবড় দুঃসাহস—তিনি চ্যালেঞ্জ করেন সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে স্পীকার সরকার প্রধান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলকে। কোথায় যেন একটা কিন্তু আছে"।

(১লা জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

সংবাদ

প্রতিবাদ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ বাংলাদেশ টেলিভিশনে জীবনের আলো অনুষ্ঠানে সূরা আহযাবের আয়াত 'খাতামান্নবীঈন'-এর উপর চারিজন আলেম বক্তব্য রাখেন। তারা প্রত্যেকেই খাতামান্নবীঈনের অনুবাদ করেন 'শেষ নবী'। কিন্তু এই অনুবাদটি কি সঠিক? অনুবাদ ভুল করলে ব্যাখ্যাও ভুলই হবে। প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নবীঈন শব্দগুচ্ছের শাব্দিক ও ভাষাগত অনুবাদ ও অর্থ হল, 'নবীগণের মোহর'। 'মোহর' আরবীতে সেই যন্ত্র বা বস্তুকে বুঝায় যদ্বারা মোহারাঙ্কণ করা হয়। অর্থাৎ সীল মারার যন্ত্র। ইস্‌মে 'আলা (ক্রিয়া-বিশেষ্য) পদ আর তারা অর্থ করলেন শেষ নবী (Chronologically last prophet)। শেষ বা last শব্দটি বিশেষণ, বিশেষ্য নয়। আরবী বিশেষ্য শব্দ 'খাতাম'কে বাংলায় অনুবাদের সময় তারা বিশেষণ বানিয়ে ফেলেছেন। এর কোন সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করা হয় নি।

ইসলামী যুগের পূর্বে ও পরে, এমন কি আজ পর্যন্ত, আরবী ভাষার 'খাতাম' শব্দটি যখন কোন মনুষ্য পদ-বাচক বহু বচনের সাথে মুযা'ফ হিসাবে সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা দ্বারা কখনও সময়ের দিক দিয়া 'শেষ' বা Chronologically last বুঝায় না। এরূপভাবে সম্বন্ধ পদে মুযা'ফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে 'খাতাম' শব্দের অর্থ Chronologically last বা সর্বশেষ বুঝায়েছে, তার একটি দৃষ্টান্তও আরবী সাহিত্য হতে কেহ দেখাতে পারবেন না। উপরোক্তরূপে 'খাতাম' শব্দ ব্যবহৃত হলে, ইহার অর্থ হয় ঐ পদবাচ্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, সর্বাধিক গুণসম্পন্ন, পূর্ণগুণাধার ও প্রভাব বিস্তারকারী, যিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রাচুর্যে অন্যকেও শ্রেষ্ঠ বানাবার যোগ্যতা রাখেন এবং অন্যদের শ্রেষ্ঠত্বের সত্যায়ন করার ক্ষমতা রাখেন। এভাবে তিনি সত্যায়নের সীল বা মোহর হয়ে যান। উদাহরণ-স্বরূপ খাতামুল কাতেবীন, খাতামুশ্‌ শোয়ারা, খাতামুল মুহাজেরীন, খাতামুল আওলিয়া ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এসব শব্দগুচ্ছের প্রত্যেকটিতে 'খাতাম' শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 'শেষ' অর্থে নহে। 'খাতাম' চরম প্রশংসাজ্ঞাপক, শেষ বা সর্বশেষ কোন প্রশংসা প্রকাশক শব্দ নয়। অতএব এ অর্থ সঠিক ও সম্পূর্ণ নয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আলেমগণ গতানুগতিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ মানুষের মনো-রঞ্জন করেছেন মাত্র। কিন্তু তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'খাতাম' এর গভীরত্ব ও তত্ত্বকে জেনে শুনে গোপন করেছেন। ব্যাখ্যাবিহীনভাবে বলে দিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শেষ নবী। অথচ পবিত্র কুরআনের কোথাও লিখা নাই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। একথাও লিখা

নাই যে, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সময়ের দিক দিয়া শেষ নবীই হতেন আর এই বিশ্বাসটা যদি ঈমানের অঙ্গই হত, তাহলে আল্লাহ্তা'লা আলংকারিক ভাষায় না বলে, তাঁকে স্পষ্ট ভাষায়ই 'শেষ নবী' কথাটা বলতেন তা এ আয়াতেই হউক, বা অন্য কোথাও। কিন্তু কুরআন শরীফের কোথাও তাঁকে শেষ নবী বা Chronologically last বলেন নি। আরবী ভাষায় কি শেষ বা last শব্দের প্রতিশব্দ নেই? থাকলে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্তা'লা কেন সে শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেন নি? অবশ্য আকারে ইঙ্গিতে এবং প্রকাশ্যভাবেও একথা বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর নবুওয়ত বলবৎ থাকবে ও তাঁর শরীয়ত কায়েম থাকবে এবং তাঁর পূর্ণতম শরীয়তকে ধরাবক্ষে সঞ্জীবিত ও কার্যকর রাখার জন্য তাঁর শরীয়তের আনুগত্যের আওতায় সংস্কারকারী, ধর্মোদ্দীপক মুজাদ্দিদগণ আসবেন, নবীও আসবেন। পবিত্র কুরআনে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে (দেখুন সূরা নেসা-৪:৭০, সূরা আরাফ-৭:৩৬ সূরা হজ্জ-২২:৭৬)।

হাদীস শরীফেও এরূপ কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস: মহানবী স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-কে 'খাতামুল আউলিয়া' বলেছেন, চাচা আব্বাসকে 'খাতামুল্ মুহাজেরীন' বলেছেন কিন্তু তাদের পরেও আউলিয়া হয়েছেন, মোহাজির হয়েছেন এখনো হচ্ছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। এসব ক্ষেত্রে যদি 'খাতাম' অর্থ শেষ না হয়, তাহলে কেবলমাত্র 'খাতামান্নবীঈন' এর ক্ষেত্রে 'শেষ নবী' অর্থ হবে কোন যুক্তিতে? খামাখা রসূলুল্লাহ্র নবুওয়তকে শেষ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাঁকে নবী বানানে-ওয়াল-নবী করে আত্মিকভাবে চিরদিনের জন্য জিন্দা রেখেছেন। যেসব আলেমগণের ধারণায়, 'ঈসা নবী' দু'হাজার বৎসর ধরে আকাশে জীবিত থেকে, এখন মর ধরায় আবার আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তিনি এসে গেলে তিনি তো দেখি শেষ নবী হয়ে যাবেন। তখন 'মুহাম্মদই শেষ নবী' কথাটা কি আকাশে চলে যাবে?

'খাতামান্নবীঈন' আয়াতটি নবুওয়তের ৫ম বৎসরে নাযিল হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিশুপুত্র ইব্রাহীম মারা গেলে, তিনি তার দাফন কাফন সম্পন্ন করে, সমবেত লোকজনকে বল্লেন, 'আমার এ পুত্র যদি জীবিত থাকত, তাহলে সে নিশ্চয় সত্যবাদী নবী হত'। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই পবিত্র বাক্যটির প্রতি যে-কোন ব্যক্তি একটু প্রণিধান করলেই বুঝতে পারবেন যে, মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত 'খাতামান্নবীঈন' খেতাবের অর্থ নিজেই 'শেষ নবী' মনে করেননি। যদি তাই হত, তাহলে তিনি বলতেন, আমার এ পুত্র জীবিত থাকলেও নবী হতে পারত না। কেননা, আমিই শেষ নবী। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তিনি ইহাই জানতেন যে, তাঁর শরীয়তের অধীনে নবী আসবেন। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, আবুবকর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন যিনি নবী হবেন।

মোট কথা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে বহু শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামের ইতিহাসে যত শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গান ও সত্যদর্শী, সর্বমান্য হাক্কানী ওলামাগণ গত হয়েছেন, তারা একই সুরে বলেছেন যে, মুহাম্মদী নবুওয়তের মোহরের আওতায় তাঁর পূর্ণ শরীয়তের অধীনে যদি তাঁর উম্মতে শরীয়ত-বিহীন নবীরূপে কোন পবিত্র পুরুষের আগমন হয়, তাহলে তা 'খাতামান্নবীঈন' আয়াতের বিরোধী হবে না। তাই দেখি, রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে একদিন সাহাবাগণ যখন দুঃখিত মনে বলাবলি করছিলেন, আহা! তাঁর (সাঃ) পরে আর নবী হবে না, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তাঁদের একথা শুনার পর, তাদেরকে সাবধান করে বল্লেন, "আপনারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলুন; কিন্তু একথা বলবেন না যে, তাঁর পরে নবী হবেন না"। ঠিক এমনিভাবে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ বিভিন্ন যুগে মুসলিম উম্মতকে একথাই বলে গেছেন যে, ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদগণ তো আসবেনই। এমন কি, আখেরী যামানায় ইসলামের কঠিন ও গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে এ উম্মতের মধ্যে নবীরও আগমন হবে। খাতামান্নবীঈনের অধীনে তাঁরই শরীয়তের আওতায় উম্মতের কেউ নবুওয়ত প্রাপ্ত হলে, তা খতমে নবুওয়তের বিরোধী হবে না বলে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এহেন বুযুর্গানের সংখ্যা অনেক। এনিয়ে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক ও বাড়াবাড়ি করা হয়। সর্বশেষে বলতে চাই, কুরআনের আলঙ্কারিক ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে ভুল হলে, ঈমান নষ্ট হবার কথা নয়। এতে কেউ কাফের হয়ে যায় না। হিংসাপরায়ণ কলহবাজ হীনমন্য ব্যক্তিগণ, যারা ধর্মকে স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার বানিয়ে সুবিধা ভোগ করতে চায়, তারাই নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চায়।

এখন আমি ঐসকল সর্বমান্য বুযুর্গানের নাম উল্লেখ করতে চাই, যারা খাতামান্নবীঈন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে, তাঁর শরীয়তের অধীনে নবুওয়ত-প্রাপ্তি সম্ভব বলে মনে করতেন এবং নবীর আগমনের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন:

(১) হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কথা আগেই বলেছি, (২) আওলিয়াদের ওলী মুজাদ্দেদে আলফেসানী হযরত আহমদ সরহিন্দী (ভারতবর্ষ) (মৃত্যু-১০৩৪ হিঃ); তিনি লিখেছেন, "খাতামুর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পরে তাঁর উম্মতের মধ্য হতে এবং তাঁর (আধ্যাত্মিক) উত্তরাধিকার সূত্রে একজন নবীর আগমন হলে তাতে তাঁর খাতামুর্ রসূল খেতাবের পরিপন্থী হবে না। অতএব, হে পাঠকগণ তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী)। (৩) শেখুলকুল হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (স্পেন) (মৃত্যু-৬৩৮ হিঃ); তিনি তাঁর কিতাব ফতুহাতে মক্কিয়ায় বলেছেন, 'মানবজাতির মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত নবুওয়ত জারি থাকবে। তবে শরীয়তবাহী নবুওয়তের আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শরীয়তবাহী নবুওয়ত একটি বিশেষ ধরনের নবুওয়ত।"

(৪) হযরত ইমাম আবদুল ওয়াব শে'রানী (মৃত্যু-৯৭৬ হিজরী) ; তিনি বলেছেন, "ইহা সকলের জানা দরকার যে, নবুওয়তের ক্রমধারা (ধারাবাহিকতা) একেবারে থেমে যায়নি। কেবল শরীয়তবাহী নবুওয়তের আগমন বন্ধ হয়েছে"।

উপরোক্ত অভিমতই নিম্নের বুযুর্গানও ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপ করার খাতিরে তাদের উদ্ধৃতি না দিয়ে কেবল তাদের নাম লিপিবদ্ধ করলাম।

(৫) সুবিখ্যাত মুহাদ্দাস, দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহ্লভী (মৃত্যু-১১৭১ হিজরী) (কিতাব তফহীমাতে এলাহিয়া) ; তিনি ওহীর ভিত্তিতে লিখেছেন বলে ব্যক্ত করেছেন।

(৬) সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শেখ আবদুল কাদের কুর্দিস্তানী।

(৭) হযরত মৌলানা আবুল হাসানাৎ আবদুল হাই, ফরিঙ্গী মহল, লক্ষ্ণৌ (মৃত্যু-১৩০৪ হিঃ) (কিতাব দাফেউল ওয়াস ওয়াস নবসংস্করণ)।

(৮) হযরত মির্যা মযহারজান জাহান নক্শাবন্দী (মৃত্যু-১১৯৫ হিঃ) (কিতাব মুকামাতে আউলিয়া)।

(৯) হযরত সৈয়দ আবদুল করীম জিলানী (রহঃ)।

(১০) হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ)।

(১১) পাক-ভারত উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা কাসেম নানোতুবী (মৃত্যু-১২৯৭ হিজরী)।

(১২) পীরানেপীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর শিক্ষাগুরু হযরত আবু সায়ীদ মুবারক (মৃত্যু-৫৯৩ হিঃ)।

(১৩) হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী হুসেইন আল-হাকীম তিরমিযী (মৃত্যু-৩০৮ হিঃ)। তিনি বলেছেন, "যদি আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সময়ের দিক হতে সর্বশেষ নবী মনে করি, তাহলে হুযুর (সাঃ)-এর প্রকৃত শান, মর্যাদা, গৌরব ও অনতিক্রমণীয় শ্রেষ্ঠত্ব কীরূপে প্রকাশ পেতে পারে। ধরার বুকে সকল নবীর শেষে আগমন দ্বারা কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় না। অতএব খাতামান্নবীঈনের এরূপ ব্যাখ্যা অজ্ঞান ও বোকারাই করতে পারে।" (কিতাব খাতামাল আওলিয়া : পৃঃ ৩৪১)।

(১৪) হাফিয ও মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মদ বিন আলী শৌকানী (আল-ইমামনী) (মৃত্যু ১২৫০ হিঃ)।

(১৫) হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী, (মৃত্যু-১১২২ হিঃ)।

(১৬) হযরত আবু হাসান শরীফ (রাঃ) (মৃত্যু-৪০৬ হিঃ)।

(১৭) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু-৫৪৪ হিঃ)।

(১৮) আল্লামা আবদুর রহমান বিন খল্দুন (মৃত্যু-৮০৮)

(১৯) আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) সহ তাদের অনেকেই 'লা নবীয়া বা'দী' হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, রসূলে মকবুল (সাঃ) এর পরে এমন কোন নবী আসতে পারেন না যিনি মুহাম্মদী শরীয়তে কোন কিছু যোগ বিয়োগ করতে পারেন এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্গত না হবেন।

এ আলোচনা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'খাতামান্নবীঈন' বিষয়টির অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আগে ততটা না থাকলেও, এখন তা অযথা বাড়ানো হচ্ছে। এটা যে উদ্দেশ্যমূলক ও রাজনৈতিক স্বার্থে-প্রণোদিত, তা সুস্পষ্ট।

জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কিত ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে, দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করণের প্ররোচনা দিচ্ছে কেন? টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ কি জানেন না যে, এই সেদিন মাত্র (২৪শে ডিসেম্বর '৯৩) 'আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত' নামধারী একটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় উগ্রমৌলবাদী আন্দোলন মানিক মিয়া এভিনিউতে সম্মেলন করে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার কতবড় বিষবাষ্প ছড়িয়ে গেল? এরপরে সেই একই বিষয়কে সপ্তাহদিনের মধ্যেই আবার টেলিভিশনে প্রচার করে আরো ইন্ধন যোগানো হল না কি? বিষয়টি কি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শান্তি ও মঙ্গলের জন্য এতই অপরিহার্য যে, টেলিভিশনে দেশবাসীকে দেখানো অতি জরুরী হয়ে পড়েছিল?

আর যদি সত্যপ্রকাশের জন্য সরকার কোন সম্প্রদায়কে এ সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে, শত বৎসরের পুরাতন এই বিতর্কের সাথে জড়িত যে শান্তি প্রয়াসী সম্প্রদায় এদেশের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে রয়েছে, সেই সম্প্রদায়কে জাতীয় টেলিভিশনে নিজেদের স্বপক্ষে সত্য প্রকাশের সুযোগ দেয়া হোক। নতুবা সরকার আল্লাহ্‌র কাছে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী সাব্যস্ত হবেন।

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী পাবলিকেশন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

জানুয়ারী ৭, ১৯৯৪

আনসারুল্লাহ বার্তা

দুর্গারামপুর মজলিসের ইজতেমা ঃ

গত ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর/৯৩ ইং তারিখ দুর্গারামপুর মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমীর জনাব খন্দকার আনু মিয়া ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গা-রামপুরী ও জিলা নাযেম জনাব মোখলেসুর রহমান। ইজতেমায় মোট উপস্থিত ছিল ৯০ জন। উল্লেখ্য, এই ইজতেমায় পার্শ্ববর্তী বাশারুক ও শাহবাজপুর মজলিস হতে যয়ীম ও আনসারগণ যোগদান করেন। ২০০/৩০০ গয়ের আহমদী ভ্রাতাও এই ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন

এবং রাত বারটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ইজতেমার ক্যাসেট শুনেন এবং বেশ কয়েকজন গয়ের আহমদী ভ্রাতা বয়াত নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নাসেরাবাদ মজলিসে আনসারুল্লাহ ঃ

গত ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর/৯৩ ইং তারিখে নাসেরাবাদ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী ও জনাব আবদুল গফুর জেলা নাযেম উপস্থিত ছিলেন। এই ইজতেমায় সর্বমোট ৬২ জন উপস্থিত ছিল।

নাজির আহমদ ভুঁইয়া, সদর
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌

লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের প্রথম স্থানীয় ইজতেমা ঃ

আল্লাহ্‌তা'লার মেহেরবাণীতে গত ১৬/১২/৯৩ ইং সফলতার সংগে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ আহমদনগরের প্রথম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫/১২/৯৩ ইং লিখিত দীনি মালুমাত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে কুরআন, নযম ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন নামায ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থানীয় সদর মুরব্বী সাহেব, লাজনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট শরীফ আহমদ সাহেব এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনে স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট জনাবা আফরোজা বেগম। পরিশেষে বিজয়ী এবং উল্লেখযোগ্য খেদমতকারীগিদের পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত ইজতেমায় প্রায়। ৩৫০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাসিমা বশির, জেনারেল সেক্রেটারী

আতফাল দিবস '৯৩

গত ৩১/১২/৯৩ ইং মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, কুমিল্লার উদ্যোগে আতফাল দিবস পালন করা হয়। দিবসটির কর্মসূচী শুরু হয় ভোর ৪-৩০ মিঃ তাহাজ্জুদের নামায থেকে। এই দিনে তিফলদের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, মৌখিক পরীক্ষা, আযান, বিস্কুট দৌড়, চেয়ার খেলা, মোরগ লড়াই, ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়।

সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় ২-৩০ মিঃ। আতফালুল আহমদীয়া কি এবং কেন? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী এবং নসিহতমূলক বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ আলী আকবর ভুইয়া, হাজী শামসুল হক, হাফেয সেকান্দর আলী, এবং সর্বশেষে সভাপতি সাহেব।

এতে ৬ জন আতফাল, ১৫ জন খোদ্দাম ৭ জন আনসার ও ৩০ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ খালেদ মোশার্‌রফ
জেনারেল সেক্রেটারী

দ্বিতীয় বার্ষিক আতফাল দিবস উদযাপন

আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে নাসেরাবাদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বর '৯৩ ইং তারিখে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে ২য় বার্ষিক আতফাল দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের কর্মসূচী বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে আরম্ভ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ১৭ জন

আতফাল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, খেলা-ধূলা, আযান, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও লিখিত পরীক্ষা। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন হয় জনাব শওকত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে। মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম

আতফাল দিবস '৯৩ পালিত হয়

অত্যন্ত সাফল্যজনক ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে নাটোর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ৩১/১২/৯৩ ইং তারিখে আতফাল দিবস '৯৩ পালন করা হয়। উক্ত আতফাল দিবস ভোর ৪-১৫ মিঃ তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রায় ২৫/২৬ জন আতফাল সারাদিন ব্যাপী এই আতফাল দিবসের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, আযান, বক্তৃতা, দীনি মালুমাত ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐদিন বাদ জুমুআ সমাপ্তি এবং পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আঃ সালাম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মোঃ আবুবকর সিদ্দীক

সাউদী আরবে ৬শ' পাকিস্তানী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

"হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কমপক্ষে ৬শ' পাকিস্তানী নাগরিককে সাউদী আরবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সাউদী আরব সফর শেষে সিনেটর গাজী হোসাইন গতকাল ইসলামাবাদে একথা বলেন। খবর সিনহুয়া'র।

গাজী বলেন, সাউদীতে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেখানে পাকিস্তানী পাসপোর্টধারীদের অপরাধী মনে করা হয়। তিনি অদ্ভুত পরিস্থিতি সংশোধন-কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য গত এক দশক যাবত পাকিস্তান মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এখানে কমপক্ষে ৩০ লাখ লোক মাদকাসক্ত। কিন্তু বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা আরো বেশী এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে"।

(১৩-১-৯৪ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে)

দোয়ার এলান

আমার দাদী, আব্বা ও আম্মা দীর্ঘদিন যাবৎ যথাক্রমে, দুর্বলতা, বাতে ধরা ও প্রেসারের রোগে ভুগছেন। তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

শোক সংবাদ

গভীর দুঃখের সাথে জানান যাচ্ছে যে, সেলবরস জামাতের মাকসুদা খাতুনের মাতা রমযানেন্ নেসা ওরফে দুদার মা গত ২-১২-৯৩ই রোজ বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রে ৪ টার সময় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। সকল ভ্রাতা-ভগ্নীগণকে মরহুমার রূহের মাগফেরাত, দারাজাতের বুলন্দী ও তাঁর মেয়ে, ও নাতী-নাতনীর প্রকৃত সান্ত্বনার জন্য পরম করুণাময়ের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম

তাহফুজে খতমে নবুওয়ত

তাহফুজে খতমে নবুওয়ত অর্থ খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্-তা'লা মহানবী মুহাম্মদকে (সাঃ) খাতামান্নবীঈন বলেছেন। এই খাতামান্নবীঈন খেতাবকে কেন্দ্র করেই খতমে নবুওয়তের উদ্ভব।

মৌলবী মৌলানা সাহেবদের মতে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় নাকি নবী করীমকে (সাঃ) খাতামান্নবীঈন মানে না, আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা নাকি এই খতমে নবুওয়তকে ভঙ্গ করে নবী হওয়ার দাবী করেছেন। অতএব এই খতমে নবুওয়তকে রক্ষা করা মৌলবী মাওলানা সাহেবদের ঈমানী দায়িত্ব।

তাহফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠন সর্ব প্রথম গঠিত হয় পাকিস্তানে। এই সংগঠনের দাবী আহমদী মুসলমানদেরকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণা করে সরকারী চাকুরীর ভাল ভাল পদ থেকে অপসারণ করলে এবং নামায, রোযা, আযান ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম থেকে আইনের মাধ্যমে বিরত রাখলেই খতমে নবুওয়ত রক্ষা পাবে। খতমে নবুওয়ত রক্ষা করার এই হল একমাত্র পথ।

পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন ক্ষমতার জন্য পাগল। ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে তিনি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের একক প্রধান মন্ত্রী মানতে রাজী হননি। ভুট্টো সাহেব নির্বাচনের ফলাফলকে সম্মান দেখালে তৎকালীণ পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। এই ক্ষমতা লোভী ভুট্টো সাহেব মোল্লাদের সমর্থন লাভ করে আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখে আহমদী মুসলমান-দেরকে তার রাজ্যে সরকারীভাবে 'নট মুসলিম' ঘোষণা করলেন। কিন্তু তার শেষ রক্ষা হলনা। মোল্লারা তাকেও 'কাফের' ফতোয়া দিল, অবসান হল ফাঁসীতে মৃত্যু বরণ করে। ভুট্টো নেই, তবে ভুট্টো পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আজো শেষ হয় নি। মা মেয়ে, ভাই বোনে এখন লড়াই চলছে। হায়রে ক্ষমতার লোভ!

পাকিস্তানের পর মোল্লারা বাংলাদেশের প্রতি লক্ষ্য দিয়েছেন। বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে তাহফুজে খতমে নবুওয়তের শাখা। পাকিস্তান থেকে বহু মৌলবী মৌলানা অবতরণ করেছেন বাংলাদেশের মাটিতে। 'মহাসম্মেলন' করে ওয়াজ মাহফিল করে এদেশের মানুষকে আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন। সরাসরি এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন করছেন। দেশের বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরা এহেন স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। গুটি কতক মৌলবাদী পত্রিকা ছাড়া অবশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকগুলিতে অনবরত এ বিষয়ে প্রবন্ধ এবং প্রতিবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অপরদিকে 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' প্রবাদ

বাক্য অনুযায়ী মোল্লারা মসজিদকে তাদের প্রচারের প্রধান ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করছে। যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে না পেরে এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে নানারূপ ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। যাদের হাতে কোন দলীল প্রমাণ নেই তাদের একমাত্র অস্ত্রই হল ফতোয়া এবং তথা কথিত জেহাদ অর্থাৎ মার হাঙ্গামা।

বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচিত সরকার বিরোধী দলগুলির চাপের সম্মুখীন। তাই তাদের সমর্থক চাই। সংসদে বিশ জন মৌদুদী পন্থী সরকারকে টিকিয়ে রাখার কবচস্বরূপ বর্তমানে সরকারের একমাত্র ভরসা মৌলবাদী গোষ্ঠী। অথচ ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে ভুট্টো সাহেবকে সমর্থন করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই মৌলবাদীরাই তাকে ফতোয়া দিয়ে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। মিঃ ভুট্টোকে খতম করায় মৌদুদী সাহেব যে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। তার বিবরণ পাঠ করুন মৌদুদীর 'বিকালের আসর' নামক পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায়।

বাংলাদেশের তাহফুজে খতমে নবুওয়তওয়ালারা রাষ্ট্রপতির নামও বিনা প্রতিবাদে তাদের প্রচারণায় ব্যবহার করেছে। 'মহাসম্মেলন' হবে না বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও মানিক মিয়া এভিনিউতে মোল্লাদের সমাবেশ হয়েছে। লাঠি, রাম দা নিয়ে পুলিশের চোখের সামনে মিছিল হয়েছে। তবুও ভোটের ভিখারীরা নীরব দর্শক হয়ে আছে। ওরা হয়ত ভাবছে যে, মোল্লারা নাখুশ হলে গদীতে থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মোল্লারা কাউকেই গদীতে আরামে থাকতে দেয় না। পাকিস্তান, মিশর, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে মৌলবাদীদের কর্মকাণ্ড দেখুন। আফগানীস্থানের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। হায়! ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না, এটাই হল ইতিহাসের বড় শিক্ষা! বাংলাদেশ সরকার যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ না করেন তাহলে ভুট্টো যা পেয়েছেন মোল্লাদের কাছ থেকে তাই তারা পাবেন। আমাদের কামনা—আমাদের সরকার যেন এই ভুল না করেন। দেশটাকে যেন মোল্লাদের কবলে নিক্ষেপ না করেন।

পবিত্র কুরআন বলে, আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং এই কুরআন এবং তার বাহক মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সাঃ) প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌ই এর হেফাযতকারী (হিজর, ১০ আঃ)। খাতামান নবীঈন আয়াত পবিত্র কুরআন শরীফে আছে। স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এর হেফাযত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিশ্রুতির পর আর কারো সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু মৌলবী সাহেবরা বললেন, খাতামান নবীঈনের হেফাযত আল্লাহ্‌তা'লা করতে পারেন নি (নাউযুবিল্লাহ) তাই তারা মাঠে নেমেছেন এর হেফাযতের জন্য। আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নাকি নবওয়ত চুরি করে নিয়ে গেছেন (জনকণ্ঠ, ২৫/১২/৯৩)। আল্লাহ্‌তা'লা আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে এজন্য কোন শাস্তি দেন নি, বরং আহমদী জামাত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৩৭টি দেশে প্রায় পাঁচ হাজার শাখায় এই জামাত বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী সাহিত্য শত

ভাষায় প্রকাশ করেছে। মসজিদ-মিশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ করে পাঁচটি মহাদেশে প্রচার ও সেবা কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। কোন ভাবেই আহমদী জামাতের অগ্রগতি রুদ্ধ করা যাচ্ছে না। গত বৎসর একদিনে দুই লক্ষের বেশী লোক আহমদী জামাতের খলীফার হাতে বয়াত করেছে। আহমদীয়া মুসলিম টি, ভি, থেকে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ইসলাম প্রচারের অনুষ্ঠান দেখান হচ্ছে। অতএব সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এদেরকে আইন ও অত্যাচারের মাধ্যমে রুখতে হবে।

আহমদীরা বিশ্বাস করে মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সাঃ) খাতামান নবীঈন। খাতামান নবীঈন শব্দের যত রকম অর্থ আরবী ভাষায় স্বীকৃত তত অর্থেই নবী করীম (সাঃ) খাতামান্ন নবীঈন। তাঁর পর আর কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, শরীয়তবাহী নূতন বা পুরাতন নবীর আগমন হবে না। মহানবীর (সাঃ) পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে উম্মতি নবীর আবির্ভাব হবে। আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যে নবুওয়ত চালু ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। উম্মতি নবী শুধু মুহাম্মদী উম্মতেই আছে। অন্য কোথাও নেই। এই উম্মতি নবুওয়ত পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। মৌলানা আশরাফ আলী থানবী 'নসরুত্তিব' নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার অনুবাদ ইসলামী ফাউণ্ডেশন প্রকাশ করেছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নবী মুহাম্মদের (সাঃ) উম্মত থেকেই হবেন (দেখুন, যে ফুলের খুশবুতে দুনিয়া মাতোয়ারা, হুলিয়া, আবু নয়ীম, খাছায়েছে কুবরা, মুফতী শফীর খতমে নবুওয়ত প্রভৃতি)। মুফতী শফী সাহেব বলেছেন, শেষ যুগে আগমনকারী এই নবীর আগমনে খাতামান নবীঈনের বিরোধ হয় না (খতমে নবুওয়ত ১০৬ পৃঃ)। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাশেম নানুতবী বলেছেন,—এহেন নবীর আগমনে খাতমিয়তে মুহাম্মদীতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না (তাহ্‌জিরুন্নাস, ২৮ পৃঃ)।

হাঁ, খাতামান নবীঈনের অধীনে তাঁর উম্মতের মধ্যে আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা উম্মতি নবী (শুধু নবী নয়) হওয়ার দাবী করেছেন। এই দাবী কুরআন, হাদীস ও এই উম্মতের বুযুর্গান দ্বারা সমর্থিত। ইমাম মাহদী ও মসীহে মওউদের পদ 'উম্মতি নবীর' পদ। অন্য নবীর উম্মত যে পদমর্যদা পায়নি মুহাম্মদের (সাঃ) উম্মতে সেই পদ লাভ করেছেন ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ। মুফতী শফী সাহেব বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মহানবীর (সাঃ) পর উম্মতের সংস্কারের জন্যে যিনি আবির্ভূত হবেন তিনি নবুওয়ত পদে বহাল থেকেও নবী করীমের (সাঃ) শিক্ষা আদর্শের অনুসারী হবেন (মা'রেফুল কুরআন ৭/১৭৭)। আহমদী জামাত একথাই বলে। আহমদী মুসলমানরা নতুন কোন নবী মানেনা। মহানবীর (সাঃ) প্রতিশ্রুত উম্মতি নবী ইমাম মাহদীকে (আঃ) মানে।

বিগত ২৪ ডিসেম্বরের তথাকথিত মহাসম্মেলন আহমদী জামাতের নাম দেশের কোণায় কোণায় পৌঁছে দিয়েছে। যা আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়েও করতে পারতাম না। ইনশাল্লাহ এখন লোকেরা প্রকৃত সত্যকে জানবে। ইতিমধ্যেই জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কাজ হবে মহানবীর (সাঃ) মর্যাদাকে যথাযথভাবে প্রচার করা।

৭০তম সালানা জলসা

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন আগামী ৪, ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ রোজ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৭০তম সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

উক্ত সালানা জলসার গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সম্বলিত এ জলসায় প্রত্যেক ব্যক্তির যোগদান করা আবশ্যকীয়, যারা পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদি সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সামান্যতম বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতা'লা মুখলেস ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করে থাকেন এবং তাঁর পথে কোন শক্তি এবং কোন কষ্ট ব্যর্থ হয়ে যায় না"। তিনি বলেন—"এ জলসাকে সাধারণ জলসাগুলোর ন্যায় মনে করবেন না। ইহা সেই বিষয়, যার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন এবং ইহার জন্যে জাতিসমূহকে প্রস্তুত করেছেন, যারা অচিরেই এসে এতে যোগদান করবেন। কেননা ইহা সর্ব শক্তিমানের কাজ যাঁর সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নয়"। হুযুর (আঃ) আরো বলেন — অবশেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা এ লিল্লাহি (অর্থাৎ—আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য) জলসায় যোগদানের জন্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাঁদের বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা তাদের জন্য সহজ করে দিন, সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাদেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। তাদের সকল শুভ কামনা রূপায়নের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করুন এবং পরকালে নিজ সে সকল বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করুন, যাদের উপর তাঁর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং সফরান্ত অবধি তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হউন। হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এ দোয়াসমূহ কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর, কেননা প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত নসিহত ও দোয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে আসন্ন সালানা জলসায় যোগদান এবং জলসার সুষ্ঠ কামিয়াবীর জন্যে দোয়া জারী রাখতে সকল আহমদী সদস্যকে অনুরোধ করছি। উক্ত জলসায় লাজনাদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী

সেক্রেটারী, জলসা কমিটি '৯৪

لا إله إلا الله محمد رسول الله

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মুসলিম টিভি আহমদীয়ার অনুষ্ঠান প্রচার

আমরা আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, লণ্ডন থেকে MUSLIM TV AHMADIYYA ১৯৯৪ সনের ৭ই জানুয়ারী থেকে প্রত্যহ ১২ (বার) ঘন্টার একটি প্রকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এ অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন একঘন্টা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে তেলাওয়াতে কুরআন মজীদ ও তার বাংলা তরজমা, ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী-নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা, ইসলামী খেলাফত ও তার রূপরেখা এবং সমসাময়িক সমস্যাবলীর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানসহ অতীব জরুরী ধর্মীয় বিষয়াদি উপস্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানটি ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত প্রচারিত হবে (সময়ের পরিবর্তন হতে পারে)।

ডিশ এন্টেনার প্রভাবে যখন সমাজ কলুষিত হচ্ছে, তখন আহমদীয়া জামাত সারা পৃথিবীর মানুষকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল খাতামান্নবীঈন (সাঃ)-এর পথে আহ্বান করছে। তাই আসুন, আমরা এ আহ্বানে সাড়া দেই ও আমাদের বংশধরদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি।

প্রচারে: অডিও ভিডিও বিভাগ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

(১৪/১/৯৪ তারিখের সাপ্তাহিক সুগন্ধার সৌজন্যে)

সম্পাদকীয়ঃ

শিরকে রিসালত !

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ২৭শে নভেম্বর (১৯৯৩) সংখ্যায় 'শির্ককারীদের থেকে সতর্ক থাকুন' শিরোনামের একটি সংবাদ দেখে বিস্মিত হলাম। 'জাতীয় মসজিদে' প্রদত্ত খুৎবায় মৌলানা উবায়দুল হক নবুওয়ত ও রেসালতের ব্যাপারে শিরককারীদের থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নাকি নবুওয়তের উপর ভাগ বসিয়ে শিরক করেছেন। নবুওয়তের ব্যাপারে কীভাবে যে শিরক হয় বা হতে পারে তা কোনদিন ইসলামী বিশ্বের কেউ শুনেছেন কি? শির্ক শব্দটি ধর্মীয় অঙ্গণে খাসভাবে আল্লাহ্র তৌহীদের একত্ব ও ঐকিকতার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ্র একত্ব ও ঐকিকতা ভঙ্গের নাম শির্ক। আল্লাহর সাথে কাউকে বা কিছুকে সমান মনে করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করাকে ইসলামী পরিভাষায় শির্ক বলে। এই শির্ক শব্দ নবুওয়তের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ, একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের কেউই "লাশারীকালাহু" ছিলেন না। বরং আল্লাহর বান্দা বা রসূল হবার কারণে তারা পরস্পরের সমগোত্রীয় এবং একই ভ্রাতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রসুলি। আল্লাহর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করো না, সবাই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। মুহাম্মদ (সাঃ)ও আল্লাহর বান্দা-রসূল। এই হিসাবে অন্য নবীরাও তাঁর মর্যাদার শরীক বা অংশীদার। অন্যদিকে মানুষ মাত্রই আল্লাহর বান্দা বা আব্দ, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও আব্দ। এই হিসাবে তারা পরস্পরের শরীক। অতএব নবুওয়তের ব্যাপারে কেউ অংশীদার হলেও তা 'শির্ক' বলে গণ্য হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্তা'লা তাঁর পাক কুরআনে অতি স্পষ্ট ভাষায় হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর মুখ দিয়েই বলায়েছেন—'কুল' ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, ইউহা ইলাইয়া'। হে রসূল, তুমি ঘোষণা কর, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হয়'। আল্লাহর বাণী-বাহক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মরণশীল মানুষেরই মধ্যে একজন। অতএব, মানুষ তাঁর (সাঃ) সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে এবং তিনি মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হবেন, এটাইতো নবী জীবনের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদের উপাস্য নন। বরং আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আদর্শ মহামানব। তিনি অতি মানব নন, মানবাতীতও নন। অতএব তাকে ঘিরে যারা শিরক রচনা করে এবং সাবধান থাকতে বলে, তারা তাকে (সাঃ) প্রকারান্তরে খোদার আসনে বসায়ে নিজেরাই শিরক করে, নাউযুবিল্লাহ্। এরকম একটা অলীক, অ-ইসলামী ধারণা তথাকথিত জাতীয় ইমামের অসঙ্গত অতিভক্তি হতে উপজাত হতে পারে, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান হতে উৎপন্ন হয়।

এখানে, অতিভক্তি-সংজ্ঞাত শিরকের একটি উদাহরণ দিতে চাই। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর, আতিভক্তির আতিশয্যে তাঁকে খোদার একক জাত পুত্র বানিয়ে স্বর্গে চড়ায়ে খোদার পার্শ্বে চিরজীবিত রেখে দিল এবং ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁর পূজা করতে লাগল। এ ভুল যাতে মুসলমানরা না করে, সেজন্যে তিনি (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে বহু সাবধান করা সত্ত্বেও এবং কুরআনে ঈসা (আঃ) মারা গেছেন বলে অনেক আয়াত থাকা

(অবশিষ্টাংশ সূচী পত্রে দেখুন)

15th January, 1994

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury